রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, রঙ্গপুর। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

ষোড়শ ভাগ। ১ম—৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত কালীপদ বাগচী, পত্রিকাধ্যক্ষ

—:•:—

রঙ্গপুর

রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার

সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী।

১২৮।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা

সুধা প্রেস

হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

এক টাকায় পরিষৎ গ্রন্থাবলী ।।

রংপুর সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী সুলভ মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যাঁহারা সম্পূর্ণ সেট্ গ্রহণ করিবেন তাহাদিগকেই উল্লিখিত সুলভ মূল্যে গ্রন্থাবলী প্রদান করা হইবে। গ্রন্থাবলী নির্দ্দিষ্ট সেট্ মাত্র আছে সুতরাং যাঁহারা নিশ্চিতভাবে পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদের অর্ডার প্রেরণ করিবেন। গ্রন্থাবলীর মাশুল গ্রাহকের স্বতন্ত্র দেয়। রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানে রেলপথে সেগুলি পাঠান যাইতে পারে। উহাতে মাশুল অনেক কম পড়িবার সম্ভাবনা।

১। চণ্ডিকা-বিজয় (মহাকাব্য) রঙ্গপুরের কবি দ্বিজ কমললোচন কৃত শক্তি বিষয়ক আদি গ্রন্থ। ডিমাই ৮ পেজী আকারে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ টাকা।

২। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ (আদিকাণ্ড)—উৎকৃষ্ট কাগজে রয়েল ৮ পেজী আকারে ২৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ টাকা।

৩। আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট (অভিনব স্মৃতি গ্রন্থ) কোচবিহারের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ বক্সি মহাশয় সঙ্কলিত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ বিদ্যারত্ন শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় সম্পাদিত। দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত, ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ১৬০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ॥০ আনা।

৪। নিমাইচরিত (সংক্ষিপ্ত গৌরাঙ্গ চরিত) স্বর্গীয় গোবিন্দকেলী মুন্সী প্রণীত; ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে ৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য।০ আনা।

যাঁহারা সম্পূর্ণ সেট্ গ্রহণ করিবেন তাঁহাদিগকে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা প্রতিবর্ষ ৩৲ টাকা স্থলে ১৲ টাকায় দেওয়া যাইবে। অন্যের পক্ষে অর্দ্ধমূল্য ১।০ টাকা দিতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর শাখার
ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত

কৃষি প্রবন্ধ

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, কয়েক বৎসর কৃষি বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া আমি যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, আমার এই বিনীত বক্তব্যে তাহার কিছু আজ আপনাদের নিকট নিবেদন করিতে চাই।

কৃষির উন্নতি সব দেশের অধিবাসিবৃন্দই অতি আগ্রহ ও অন্তরের সহিত কামনা করিয়া থাকেন, আমরাও করি। জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশ যতটা কৃষি নির্ভরশীল, এমন আর কোন দেশেই নয়; অথচ আমাদের দেশে এ বিষয়টী যত উপেক্ষিত, এমনও আর কোন দেশেই নয়। আমাদের দুঃখ দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ যে এই অলস নিশ্চেষ্টতা, নিরুদ্যম পরনির্ভরতা, অভ্যস্ত পরিশ্রমবিমুখতা, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। কৃষি জিনিষটা উপেক্ষার বিষয় নয়। কৃষির উপর আমাদের জাতির জীবন মরণ নির্ভর করে; অন্যান্য দেশ সাধারণতঃ শিল্প ও বাণিজ্যোপজীবী। কিন্তু আমাদের দেশ কৃষি উপজীবী। তবুও অন্যান্য দেশে কত দ্রুত কৃষির উন্নতি হইতেছে। কৃষক ছাড়াও আমাদের দেশের মজুর, শিল্পী ও ব্যবসায়িগণও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ অন্যান্য দেশের শিল্পী ও ব্যবসায়িগণের ন্যায় বিদেশ হইতে কাঁচা মাল আমদানি করেন না; ফলে কৃষির অবস্থা খারাপ হইলে কৃষিনির্ভর শিল্পী ও ব্যবসায়িগণও বিদেশীগণের সহিত প্রতিযোগিতায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আপনারা কতকটা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন—বম্বে অঞ্চলে অনেক কাপড় ও সূতার কল আছে। যদি এদেশের তুলা খারাপ ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে কলগুলির অবস্থাও যে খারাপ হইবে, তাহা অতি সহজবোধ্য। এইরূপে শতকরা প্রায় নব্বই জন লোক আমাদের দেশে কৃষিনির্ভরশীল। কাজেই কিসে কৃষির উন্নতি হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করাও তদনুপাতেই প্রয়োজন।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে অনেক রকম গৃহশিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য ছিল। কালক্রমে সেগুলি বিদেশীয় কল কারখানার প্রতিযোগিতায় ও অন্যান্য নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়াছে। ফলে পূর্ব্বে যে সমস্ত লোক শিল্পবাণিজ্যের দ্বারা অধিক অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত, তারাও দলে দলে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প লাভদায়ক কৃষিকার্য্যে যোগদান করিতে

বাধ্য হইয়াছে। শিল্পবাণিজ্যের তুলনায় অল্প লাভদায়ক কৃষিতে এখন অধিক লোককে প্রতিপালিত হইতে হয়। শিল্পবাণিজ্য লুপ্ত হওয়ার জন্য দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে কৃষির সাহায্যে উহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইলে, কৃষির যথেষ্ট উন্নতি সাধন দরকার। পূর্ব্বেকার শিল্প বাণিজ্য, নষ্ট হওয়ার জন্য অধিক সংখ্যক লোক কৃষিকর্ম্মে যোগদান করায় নানা রকমে কৃষিরও একটু ক্ষতি হইয়াছে। উহা পূরণ করিতে হইলে কৃষি বিষয়ে বেশী মনোযোগ আবশ্যক। কৃষি কর্ম্মে অধিক সংখ্যক লোক যোগদান করায় প্রায় সমস্ত অনাবাদী পতিত জমি এখন কর্ষিত হইতেছে। ইহার জন্য গোমহিষাদি পশুচারণ ভূমির অত্যন্ত অভাব অনুভূত হইতেছে। উপযুক্ত খাদ্যাভাবে গো, মহিষাদি পশু সকল দুর্ব্বল, অসুস্থ ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে এবং কৃষি কর্ম্মেরও তাহাতে ক্ষতি হইয়াছে। এদিকে কৃষকের সংখ্যা যে অনুপাতে বাড়িয়া গিয়াছে, তদনুপাতে জমির পরিমাণ বাড়ে নাই। আগেকার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমির উপর অধিক সংখ্যক লোক নির্ভর করিতেছে, সুতরাং অতি কর্ষণের প্রয়োজন, হইয়াছে। ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তিও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। এই সমস্ত কারণেই কৃষির উন্নতি একান্ত আবশ্যক।

বর্ত্তমানে দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে শিল্পে, বাণিজ্যে বিদেশীয় অর্থশালী শিল্পী ও বণিকগণের সহিত প্রতিযোগিতা করা বড় সহজ সাধ্য নয়, কিন্তু এদেশে সকলেরই ১০।৫ বিঘা জমি আছে। যদি কৃষির উন্নতি হয়, তবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি দুএরই অর্থবৃদ্ধি হইয়া উঠিবে, দেশের দারিদ্র্যও দূর হইবে। এমন একদিন আসিতেও পারে, যে দিন আমরা অন্যান্য দেশের সহিত সব বিষয়েই প্রতিযোগিতা করিতে পারিব। আমাদের দেশে ইহার উপরেও একটা সুবিধা আছে। কৃষি বিষয়ে বিশেষভাবে এ কথাটা বলা যাইতে পারে। অন্যান্য দেশের মত আমাদের Labour ও Capital বলিয়া তেমন সম্পূর্ণ পৃথক দুই দল নাই। অন্যান্য দেশে এই দুই দলে স্বার্থ সংঘর্ষ মাঝে মাঝে যে আকার ধারণ করিয়া উঠে, আমাদের দেশে তেমন বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ আমাদের দেশে সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে, Labourer ও Capitalist.

কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেই নিম্নের কয়েকটী বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার দরকার।

১। উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ আবাদ।

২। উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন।

৩। জমিতে সার প্রয়োগ।

৪। গবাদি পশুর উন্নতি বিধান।

(১) উন্নত যন্ত্রপাতি সাহায্যে চাষ আবাদ সম্বন্ধে আমি বেশী আলোচনা করিতে চাই না। কারণ সাধারণ কৃষকগণের পক্ষে ঐ সমস্ত অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যের লাঙ্গলাদি কেনা সম্ভবপর নয়। তারপর সেই সমস্ত ভারি লাঙ্গলাদি দ্বারা চাষ আবাদ করিতে হইলেও গো মহিষাদির

সম্ভবমত উন্নতি বিধান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, কারণ দুর্ব্বল বলদ মহিষ সেই সমস্ত লাঙ্গল টানিতে পারে না। সাধারণ কৃষকগণকে এই বিষয়ে প্রথমে চেষ্টা করিতে বলিতে চাই না। অবস্থাপন্ন কৃষকগণ এ বিষয়ে যত্নবান হইলে বিশেষ লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

(২) কৃষির উন্নতির প্রধান সোপান বীজ নির্ব্বাচন। অনেক বৎসর ধরিয়া কৃষি বিভাগ ঢাকা কৃষি ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বহু পরীক্ষার ফলে কয়েক প্রকার শস্যের কয়েক প্রকার বীজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কৃষি ক্ষেত্রেও আমরা এই বিষয়ে প্রমাণ পাইয়া আসিতেছি। আমন ধানের মধ্যে ঢাকা ১নং বা ইন্দ্র শাইল, ঢাকা ৫নং বা দুধসর, আউশ ধানের মধ্যে ঢাকা ২নং বা কটক তারা, এবং চার্ণক পাটের মধ্যে কাকিয়া বোম্বাই এবং সবুজ চড়চড়া গমের মধ্যে পুসা ৪নং এবং ১২নং তামাকের মধ্যে টেনা ও কয়েকেটোর •২১৩নং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত জমিতে আমরা ইহার আবাদ করিয়া স্থানীয় ফসল হইতে অনেক বেশী ফসল পাইয়াছি। যদি উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিলে প্রতি একার ১৲ এক মণ ফসলও বেশী হয়, তবে সমস্ত বঙ্গদেশে সব কয়টী জিলার সব শস্যের হিসাব লইলে এই বঙ্গদেশ হইতেই প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার মাল বেশী উৎপন্ন হইতে পারে। কৃষি বিভাগ এখনও শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া এদেশে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। এ বিষয়ে শিক্ষিত লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি দরকার।

(৩) জমিতে সার প্রয়োগ বিষয়েও কৃষকগণের অনেক জানিবার আছে। সার প্রয়োগের সুফল আশা করি সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়া যতদূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে গোবরই উৎকৃষ্ট সার এ কথা বলা যাইতে পারে। ঘোড়ার নাদি অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। ঘোড়ার নাদি কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া আমরা সুফল পাইয়াছি। হাড়ের গুঁড়া, সোডিয়ম নাইট্রেট, এমোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি অনেক জায়গায় ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু শেষোক্ত সার দুইটীর বিরুদ্ধেও বলা যাইতে পারে। এগুলি সাধারণতঃ নাইট্রোজেনের জন্য সাররূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে শস্যের গাছগুলি খুব বাড়িয়া যায়, এবং তজ্জন্য জমি হইতে খাদ্যোপযোগী অন্যান্য জিনিষও গাছগুলি শুষিয়া লয়। ফলে কয়েক বৎসর পরে জমি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কারণ শুধু নাইট্রোজেন ছাড়া গাছগুলির খাদ্য অনেক আছে, যাহা ঐ সমস্ত সারে উপযুক্ত পরিমাণে নাই। এই দুইটী সারের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে অন্যান্য সার পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। গোবর সার সব রকম শস্যের পক্ষে মোটামুটী ভাল। গোবর সারের অভাব অত্যন্ত অনুভূত হয়। কৃত্রিম উপায়ে নানা রকম আবর্জ্জনা দিয়া সার প্রস্তুত করা যাইতে পারে জমিতে যে সমস্ত আবর্জ্জনা ও আগাছা জন্মে, সেইগুলি যদি এক জায়গায় স্তূপাকার রাখিয়া তাহার উপর কিছু গোমূত্র ও হাড়ের গুড়া ছিটাইয়া দেওয়া যায়, তবে সেইগুলি পচিয়া উৎকৃষ্ট সার হয়।

(৪) কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে হইলে গো মহিষাদি পশুরও উন্নতি একান্ত আবশ্যক। উন্নত হলকর্ষণ উপযোগী স্বাস্থ্যবান গো মহিষাদির অভাব বশতঃই সেই সমস্ত ভারি লাঙ্গল

এতদঞ্চলে প্রচলন করার বড় অসুবিধা হয়। এদিকে নজর না দিলে উন্নত যন্ত্রপাতির কথা দূরে থাকুক, অচিরে আমাদের দেশীয় লাঙ্গলও ভাল ভাবে ব্যবহার করা যাইবে না। গোচারণ ভূমি এবং উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের অভাব বশতঃ বাঙ্গালার গোজাতির অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। বলদগুলি কৃষি ক্ষেত্রে বেশী পরিশ্রম করিতে পারে না বেশী ভার বোঝাই গাড়ী টানিতে পারে না। আর গাভীগুলি দিনে দিনে দুর্ব্বল বৎস প্রসব করিতেছে। সমস্ত কৃষকেরই ২।১ খণ্ড জমিতে গরুর খাদ্য উপযোগী শস্যের আবাদ করা প্রয়োজন। যাহাতে গোবংশের উন্নতি হয়, যাহাতে উত্তোরোত্তর দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে সুস্থ, সবল, গোবৎস পাওয়া যায় সে বিষয়ে এখানকার Cattle farm এবং ঢাকা ফারমে পরীক্ষা চলিতেছে। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভাল ষাঁড় দ্বারা পাল দিলে খারাপ গাভীও সব রকমে ভাল বৎস প্রসব করে, এবং এইরূপে কয়েক বৎসর যদি ভাল ষাঁড় দ্বারা পাল দেওয়া যায়, তবে সব বিষয়ে অতি নিকৃষ্ট গরুর বংশ হইতেই উৎকৃষ্ট বৎস জন্মিতে পারে। আমার অল্প অভিজ্ঞতা হইতে মোটামুটী কয়েকটী বিষয় নিবেদন করিয়াছি। কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে বহু বিষয়েরই আলোচনা করিতে হয়। উপস্থিত অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রয়, বিক্রয় ইত্যাদি এই সমস্ত বিষয়গুলি হইতেও বীজ নির্ব্বাচনই কৃষি উন্নতির যে অন্যতম পন্থা, ইহাই আমার মত। দেশে কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে ততটা মনোযোগ কেহই দেন নাই। কৃষিক্ষেত্রে এখন যে সামান্য পরীক্ষা হইতেছে, আমরা যদি তাহার সুফল গ্রহণ করিতে না পারি, তবে সরকারের ঔদাসীন্য বলিয়া আমাদের দোষ দেওয়া চলে না। কৃষি বিভাগ যতটুকু উন্নত বীজ বা অপরাপর বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছেন, সারা দেশ যদি সে চেষ্টাতে লাভবান হইতে উৎসুক হইয়া উঠে, তবে কৃষি কর্ম্মচারিগণ ও সরকার নিশ্চয়ই এ বিষয়ে কর্ম্ম তৎপর হইয়া উঠিবেন। আমি এই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই যে, আপনারা কৃষি বিভাগের সহিত সহযোগিতা করিয়া যেটুকু লাভবান হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন।

শ্রীভবেশ চন্দ্র রায়, ডিষ্ট্রীক্ট এগ্রিকালচারাল অফিসার, বগুড়া।

বঙ্গভাষা

সতত বাক্যকথনে, চিন্তাতরঙ্গিণীর প্রতি তরঙ্গে ভাষা মানবের চিরসঙ্গিনী ; তাই ভাষা গ্রন্থের নাম সাহিত্য।

যাবতীয় জ্ঞানরত্নদানে ভাষা মানবকে অলংকৃত করিয়া হিত সাধন করে, তাই ভাষাগ্রন্থের নাম সাহিত্য। ভাষা সমাজের চিত্র, ভাষায় মানব চরিত্রের বিকাশ, ভাষা আদর্শ চরিত্র দর্শনের দর্পণ, ভাষা জ্ঞানিজনের জ্ঞানভাণ্ডার।

যে ভাষা যত উন্নত, যে ভাষায় নানা বিদ্যার শাস্ত্র গ্রন্থ যত জ্ঞানরত্নপূর্ণ, সে ভাষা ভাষী তত উন্নত।

এই কারণে সাঁওতাল, কোল, ভিল, নাগা, কুকি প্রভৃতি উন্নত মাতৃভাষার অভাবে মানুষ হইয়াও মানুষ নহে। আবার উন্নত ভাষার গুণে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি উন্নত।

মহাপুরুষ রামমোহন রায় সূতিকাগারের শিশুর ন্যায় গদ্য বঙ্গভাষাকে সর্বপ্রথম ব্যাকরণ সাহিত্য, ভূগোল, উপনিষদ আদি নানা বেশ ভূষায় সাজাইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষর আধুনিক নহে। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের তন্ত্রাদিতে বাঙ্গালা বর্ণমালার রূপ বর্ণনা আছে। তৎকালে বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য লিখিবার পদ্ধতি ছিলনা।৭ শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা রচনা, রামায়ণ, মহাভারত ও বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহ, মধুর পদ্য কবিতায় নিবদ্ধ।

তৎকালে গদ্য প্রচলিত থাকিলে সমাজ চিত্র অধিকতর পরিস্ফুট হইত। ইহার অভাবে যে সময়ে সংস্কৃত ভাষা কথ্যভাষা ছিল, তৎকালে কালিদাস আদি মহাপুরুষদের অতি উচ্চ আদর্শ সামাজিক চিত্রাঙ্কনের পর আমরা প্রায় সহস্র বৎসরের সমাজ চিত্র পরিস্ফুটরূপে অবগত নহি।

আধুনিক যুগে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ও তারাশঙ্কর প্রভৃতির জমাট বাঁধান বাঙ্গলাভাষার পর বঙ্কিম যুগ হইতে বর্ত্তমান সবুজপত্রী যুগ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য ভাবের অনুকরণে নাটক, নভেল, উপাখ্যান ইত্যাদির প্রভাবে লোক চরিত্র, সমাজচিত্র, বহুলভাবে চিত্রিত হইতেছে। পাশ্চাত্যভাব ও আচার প্রিয় লেখকগণ দেশীয় চিত্র হীনপ্রভ করিয়া পাশ্চাত্যভাবে চরিত্র অঙ্কনে দেশীয়ের চিত্ত বিচলিত করিতেছেন। ইহাতে সমাজের হিত কি অহিত সাধিত হইতেছে, তাহা বিজ্ঞগণের বিচার সাপেক্ষ।

ইউরোপের প্রাচীন গ্রীক লাটিন আদি মৃত ভাষার ন্যায় ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা মৃত হইলেও অনন্ত জ্ঞান রত্নের আকর, রত্নাকর।

ভারতের যাবতীয় প্রাদেশিক মাতৃভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত শব্দমূলক ব্যাকরণ সংস্কৃতের পদ্ধতিপূর্ণ এবং সংস্কৃত ভাবে গঠিত। অধুনা অনেকে বাঙ্গালার সংস্কৃতের এইরূপ আনুগত্য ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাষায় পরিণত করিতে চাহেন, ইহা অনেক মনীষী ব্যক্তি সঙ্গত বোধ করেন না।

বাঙ্গালা কর্ম্ম, কর্ত্তা, ক্রিয়া আদি স্থাপনের যে বিধি ছিল, তাহাও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইংরেজীর ভাব রাজি বাঙ্গালায় প্রবিষ্ট হইয়া যেমন ভাব ও ভাষা পুষ্ট হইতেছে—তেমনি পদ স্থাপন প্রণালীও ইচ্ছায় বা অসতর্কতায় ইংরেজীর অনুরূপ হইতেছে। যেমন "আমি ভিতরে যাইতেছি এমন সময়", এ স্থলে "আমি যাইতেছি ভিতরে এমন সময়" এরূপ লিখিতেও অনেকে কুণ্ঠিত নহেন।

সজীব প্রচলিত ভাষায় নিয়ত পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য, তবে সেই পরিবর্ত্তন শুভ কি অশুভ ইহা প্রণিধানযোগ্য। বিদ্যাসাগরী ভাষার উপর খড়্গহস্ত হইয়া অনেকে আধুনিক কথ্য ভাষায় সর্ব্ববিধ গ্রন্থে প্রয়োগ করিতে চাহেন। তাহাদের মূলযুক্তি, "বর্ণনা কবির ভাষার জটিলতা বা ভাবের গাম্ভীর্য্যে দুর্ব্বোধ্য না করিয়া কথ্য ভাষায় সহজবোধ্য করা উচিত। এই যুক্তি সঙ্গত বটে। কিন্তু অনেকে বলেন, অল্প কথায় গম্ভীর ভাষায়; একটু চিন্তা সাপেক্ষ করিয়া মধ্যে যাহা লিপিবদ্ধ করা যায়, কথ্য ভাষায় তাহা স্বরূপ করিতে প্রয়াস পাইয়া এক পৃষ্ঠায়ও ভাষা পরিস্ফুট হয় না। বিশেষতঃ বর্ণিত মূল কথাটা কোথায় লুকাইয়া যায়, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ভাষাগ্রন্থের বহু শ্রেণী বিভাগ আছে। তন্মধ্যে নাটকাদি বা গল্পগ্রন্থ সবুজপত্রী কথ্যভাষার হইয়া, উচ্চ অঙ্গের ভাবময় গ্রন্থাদি পূর্ব্ব প্রচলিত লেখ্য ভাষায় হওয়াই অনেকে সঙ্গত বোধ করেন। বিভিন্ন ভাষা হইতে সম্পদরাজি নিজভাষায় আহরণ না করিলে ভাষা উন্নত হয় না, জাতিরও উন্নতি হয় না। অতি পূর্ব্বকালে গ্রীক্ জাতির সহিত হিন্দু জাতির পরস্পর আদান প্রদানে উভয় জাতি, গণিত, জ্যোতিষ, ভাস্করচর্চ্চা আদি কত বিদ্যা উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহার সীমা নাই।

বর্ত্তমান যুগেও ইংরেজ আদি প্রতীচ্য ও প্রাচ্য জাতির মিলনে তদ্রূপ বিনিময় ঘটিতেছে। প্রাচ্য প্রতীচ্যের শিল্প বিজ্ঞান পাইতেছেন। প্রতীচ্য প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকভাব গ্রহণ করিতেছেন, নতুবা কি বিনা কারণে বেলুড়ের মঠে আমেরিকান ও বিলাতী লোকের আবির্ভাব হয় এবং এদেশবাসী ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যায়।

আজকাল বহু মুদ্রাযন্ত্র ও সাময়িক পত্রিকাদিতে সাহিত্যের অঙ্গীয় গল্পমালা, নাটক, নভেল, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আদি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা পুষ্ট হইতেছে, কিন্তু বহু কাল অবধি বাঙ্গালা ভাষার উপর বিধাতার অভিসম্পাত এই যে, শুধু বাঙ্গালা চর্চ্চায় কেহই শাস্ত্রজ্ঞ বা জ্ঞানবান বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতে পারিবে না; কোনও পুরশ্চরণ দ্বারাই এই অভিসম্পাতের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে না।

আইন, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, দর্শন আদি কোনও শাস্ত্রের জ্ঞান গরিমার বিষয়ই শুধু বাঙ্গালা শিক্ষায় হইতে পারে না। এই অভাব দূরীকৃত না হইলে, যাবতীয় শাস্ত্রচর্চা বাঙ্গলায় হইবার বিধান না হইলে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালীজাতির পূর্ণ উন্নতি কেবল নভেল ইত্যাদিতে হইবার নহে।

প্রাচীনদের নিকট শুনিতে পাই অনধিক ৫০ বৎসর পূর্ব্বে চিকিৎসা ও আইন আদির চর্চ্চা শুধু বাঙ্গালায়ও হইত বাঙ্গালা নবীশ অনেক উচ্চ রাজকর্ম্মের অধিকারী হইতে পারিতেন, এবং রাজবিধিতে বাঙ্গালায় ঐ সব শাস্ত্রের চর্চ্চা হইত। বাঙ্গালায় চিকিৎসা বিজ্ঞানাদির বহু গ্রন্থের প্রচার হইয়াছিল, এখন সে বিধি দূরীকৃত হইয়াছে। এখন বাঙ্গলা নবীশের হাকিমী ওকালতি দূরের কথা, চৌকিদারীও জুটে কি না সন্দেহ। এই ভাব ভাষার পরিপুষ্টি ও জাতীয় উন্নতির পোষক কিনা বিচারসাপেক্ষ। পাচ ফলে ফলের সাজি সুশোভিত হয়। নানা ভাষা হইতে জ্ঞানগর্ভ বিষয় সংগৃহীত হইয়া ভাষা পরিপুষ্ট ও সুশোভিত হয়। তাহার চর্চ্চায় জাতির উন্নতি হয়। পরভাষায় আলোচিত জ্ঞান জাতির ইতর ভদ্র সকলে পাইতে পারে না; সুতরাং মাতৃভাষায় সর্ব্বশাস্ত্রচর্চ্চা ভাষা ও জাতির উন্নতির নিদান। ভাষায় জ্ঞানিগণের জ্ঞান সঙ্কলনের ফলে লোকে তাহার চর্চ্চা দ্বারা সদাচারী ও শাস্ত্রজ্ঞ হয়, পক্ষান্তরে কুগ্রন্থে কদাচারী হয়। ভাষার গুণে সমাজে ওজস্বী ভাব, স্বাধীন প্রবৃত্তি আগমন করে; কোনও কোন মহাপুরুষ ভাষাকে তদ্রূপ চিত্তবিনোদন শক্তি দান করেন।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা পদ্ধতি সহ অনেক হিতকর জ্ঞানময় বিষয় বাঙ্গালা ভাষাকে দান করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি অন্যবিধ শ্রেষ্ঠ দান মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ। অনেকে বিশ্বাস করেন, এই ছন্দের বলে বাঙ্গালা ভাষা অতি তেজস্বিনী হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষায় যাবতীয় উচ্চ অঙ্গের তেজোময়ী বর্ণনার সুযোগ হইয়াছে, ভাষার নবপ্রাণ, নব তেজের আবির্ভাব হইয়াছে। ভাষার যে তেজবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানে বর্ণিত

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে
　　　চায় হে! কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে
　　　পায় হে! কে পরিবে পায়?"

এবং মাইকেল লিখিত মেঘনাদ বধে—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিলা সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধি, শাল্মলী তরুবরে?"

পাঠ করিলেই বুঝা যায়। বাহুল্য ভয়ে নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতির তেজোময়ী কবিতা এ স্থলে উল্লেখ করিতে সাহস হইল না।

বস্তুতঃ মাইকেল তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের ভূমিকায় যে খেদোক্তি করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

এই আখ্যায়িকায় ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভাষা তেজস্বিনী হইলে সেই ভাষাভাষী লোকও তেজস্বী হইয়া উঠে, পরোক্ষভাবে জাতির গঠন হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, বঙ্গভাষায় যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের চর্চ্চা দ্বারা যেমন সমাজের নিম্নস্তর হইতে উর্দ্ধতন সকলকে জ্ঞানবান ও কর্ম্মঠ করিয়া তোলা দরকার, তেমনি নিগড়মুক্ত ভাষা পাইয়া তেজস্কর বর্ণনার সহায়তায় তেজোময় ভাবে জাতির উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

উপসংহারে আর একটী কথা বলা আবশ্যক যে, বঙ্কিমচন্দ্র অতি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক চিত্র অবলম্বন করিয়া বৃহৎ আখ্যায়িকা বর্ণন ও উন্নত চরিত্র অঙ্কন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; তিনি দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ আদি কত উন্নত চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সমাজে বহু আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস এই যে, ঐ রীতি অবলম্বনে আধুনিক বহু লেখক সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত মহাপুরুষদের চরিত্র অবলম্বনে কত গ্রন্থ প্রচার করিতেছেন, কিন্তু লেখকের রুচি অনুযায়ী সে সব চরিত্রের উৎকর্ষ অনেক স্থলে ম্লান হইয়া যয়ে।

• কুমারী সিন্ধুবালা আতর্থী।

কবি গোবিন্দ দাসের কাব্যালোচনা ।

বঙ্গ-বাণী কুঞ্জের কলকণ্ঠ কোকিল সুকবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস এক অনন্যসাধারণ কবিত্ব শক্তি লইয়া এদেশে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত ভাওয়াল—জয়দেবপুরে, এক দরিদ্র গৃহস্থের গৃহে আবির্ভূত হইয়া, আমরণ নানা দুঃখ, কঠোর দারিদ্র্য ও প্রাণস্পর্শী নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া, জীবন যাপন করিতে করিতে, নিতান্ত অনাদৃত ভাবে, ঢাকা নগরীর এক প্রান্তে, ১৩২৫ সনের আশ্বিন মাসে জগতের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

গোবিন্দদাস একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি হইয়াও, দেশবাসীদের কাছে, জীবদ্দশায় উপযুক্ত সমাদর লাভ করা দূরে থাকুক, অন্যায়রূপে উপেক্ষিত হইয়া গিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, তাঁহারা এদেশে সম্মানার্হ এবং উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত; আর অত্যাচারিত হইয়া, তিনি অনাদৃত! এ বড় কম দুঃখের কথা নহে।

আমরা শতকণ্ঠে বলিব যে, তিনি দরিদ্র ছিলেন বলিয়াই এ দেশ তাঁহার পানে ফিরিয়া তাকায় নাই। "দারিদ্র্য দোষোগুণরাশিনাশী", এই কবি প্রবচনটী গোবিন্দদাসের প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য বটে; কিন্তু, কেবল তাহাই নহে। গোবিন্দদাস পরপদলেহন করিতে জানিতেন না; তিনি অতিশয় তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী লোক ছিলেন,—কাহারও মুখ চাহিয়া কথা কহিতেন না এবং নিজের ঢাক নিজে বাজাইতে পারিতেন না। এমন কি, রাজ-নির্য্যাতনে ভীত হইয়া, একদা ভীরুর মত তোষামোদ করিতে পারেন নাই। এ জন্যই বুঝি বা তিনি অনাদৃত! বলিতে লজ্জা হয় যে, তাহার স্বদেশ ঢাকায় তিনি এতদূর উপেক্ষিত হইয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁহার চিতা মূলে ঢাকা নগরীর একজন সাহিত্যিকেরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। হায় রে দেশ! এদেশে প্রকৃত প্রতিভার পূজা হয় না। কবির মৃত্যুর পর সুকবি কালিদাস রায় যে কঠোর সত্যকথা লিখিয়া তাঁহার স্মৃতি-তর্পণ করিয়াছিলেন, আমরা এস্থলে তাহার কতকাংশ উল্লেখ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছিলেন;—

"পরিষদের সভায়, রাজা মহারাজের তাজের ছটা
গ্রন্থশালায় রাজে হাজার ছবি;
সম্মিলনে—সম্মেলনে মহোৎসবের প্রমোদ ঘটা,
পায়না খেতে হায়রে কাঙাল-কবি।"

আবাল্য সুখ সচ্ছন্দতার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া এদেশের অনেকেই সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। কেহ কেহ বা জীবিতকালেই সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাদের তুলনায় কবি গোবিন্দ দাসের স্থান অনেক উচ্চে। অভাব ও দারুণ দৈন্যের ভিতর দিয়া জীবন যাপন করিয়া, আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিয়া, একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য সেবা করা নিতান্ত সামান্য কথা নহে। এজন্যই কবি গোবিন্দদাস এদেশের অনেকের শিরোভূষণ।

গোবিন্দদাস বড় কষ্টে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি কি ভাবে থাকিতেন—কি আহার করিতেন, এ দেশ তাহা লক্ষ্য করা আবশ্যক মনে করে নাই, তাহা হইলে বিদ্বজ্জন-সমাকীর্ণ ঢাকা নগরীতে, তাঁহার শোচনীয় ভাবে মৃত্যু হইত না।

পরলোক হইতে তাঁহার আত্মা, তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের আজিকার এই আলোচনার জন্য কি ভাবিতেছেন জানি না। তিনি কিন্তু, জীবদ্দশাতেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন :—

"যা হ'ক্ আমি শত ধন্য,
কৃতজ্ঞ কৃতার্থম্মণ্য
তোমাদের এ স্নেহের জন্য
আজ তোমাদের সন্নিকট ;

চিতায় মঠ দিবে কেহ,
গড়্‌বে ছাঁচ্যা অৰ্দ্ধ দেহ,
ছায়া চিত্র রাখ্‌বে কেহ,
কেউবা তৈল চিত্র-পট !

করবে তোমরা শোক-সভা,
চক্ষে চস্‌মা শ্বেত-জবা,
ওষ্ঠে চুরুট ধূম্রপ্রভা,
করতালি চট্ চট্ !

স্বর্গ কিম্বা নরক হ'তে
আস্‌ব তখন আকাশ পথে,
দেখ্‌তে আমার শোক সভা,
সঙ্গে নিয়ে অলকট্।"

এইরূপ শ্লেষাত্মক উক্তির পর, কবি গোবিন্দদাস প্রসঙ্গে আমাদের কোন কথা বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতাপ রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে নাকি পাপক্ষালন

হয়, সেই আশায় এই নগণ্য প্রবন্ধের অবতারণা। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের মেরুদণ্ড শ্রদ্ধাভাজন গুণগ্রাহী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের ঐকান্তিক অনুরোধে, নিতান্ত দুঃসাহসের সহিত গোবিন্দদাসের কাব্যালোচনা করিতে যাইতেছি।

কবি গোবিন্দ দাসের বিচিত্র জীবনের দুঃখময় কাহিনী, বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করায় এ স্থান নহে। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনী গ্রন্থে আপনারা সে সন্ধান পাইবেন। আজ আমরা কেবল তাঁহার অগ্নিগর্ভ জ্বালাময়ী কবিতাবলীর যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। লাঞ্ছিত জীবনের মধ্য দিয়া, কি ভাবে কবির প্রাণে প্রবল দেশাত্মবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিব।

কবি গোবিন্দ দাসের প্রায় অধিকাংশ কবিতাই দুঃখবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুঃখের অভিব্যক্তি তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত এবং জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধ। গোবিন্দদাস Pessimistic কবি হইলেও তাঁহার রচনার কুত্রাপি বৈদেশিক দুঃখবাদের চিহ্নমাত্র নাই।

অসময়ে সন্তান নাশ,—প্রবল রাজপীড়া—অনিচ্ছায় পরবশতা—অকালে পত্নী বিয়োগ—অবশেষে জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসন প্রভৃতি দৌর্ম্মনস্য তাঁহার কবি জীবনকে একেবারে তিক্ত-বিষাক্ত করিয়াছিল। তাঁহার প্রায় সমস্ত রচনায় উল্লিখিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার কবিতা বস্তুতন্ত্রমূলক এবং স্থানে স্থানে তাহা ব্যক্তিগতভাবসমন্বিত হইলেও, সে সমস্ত, সর্ব্বত্র জনসাধারণের মনের অনুভূতি, প্রবল বেগে জাগাইয়া তুলিতে সমর্থ। সর্ব্বোপরি তিনি বৈদেশিক ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া, বাঙ্গালীর বিশেষত্ব তাঁহার কবিতায় দেদীপ্যমান্। এজন্যই তাঁহাকে আমরা খাঁটি বাঙ্গালী কবি বলিতে স্পর্দ্ধা করি।

এ যুগের বিশিষ্ট কবিগণের মধ্যে ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অথচ প্রতিভাবান্ সুকবি, আর দ্বিতীয়টী আপনারা খুঁজিয়া পাইবেন কি না সন্দেহ।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, খাঁটি বাঙ্গালী কবি হইয়াও তিনি বাঙ্গালীর নিকট অনাদৃত হইয়া গিয়াছেন। নিজের জন্মস্থান যাহাকে অনাদর করে সে দাঁড়াইবে কোথায়? তাই তিনি নীড়হারা পক্ষীর মত নানাস্থানে অস্থির ভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অথচ দীনহীন অবস্থার মধ্যে রহিয়াও, মৃতপ্রায় বাঙ্গালীকে অমৃতোপম কাব্য-সুধা বিতরণ করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই।

গোবিন্দদাস জীবনে যে সকল নির্য্যাতন এবং দুঃখভোগ করিয়া গিয়াছেন, এদেশের আর কোনও সাহিত্যিকের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। স্বজাতির পীড়ন সহ্য করতে না পারিয়া ন্যায়-পরায়ণ নির্ভিক কবি টলষ্টয়ের (Tolstoy) এর মত আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

কবি গোবিন্দদাস পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত ভাওয়ালের বনভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। নানাবিধ নৈসর্গিক সম্পদসম্ভার পরিপূর্ণ, পরম রমণীয় সেই বনভূমির অধিপতি ছিলেন জনহিতৈষী, প্রজাপ্রিয় রাজা কালীনারায়ণ রায়। তাঁরই অপার দয়ায়, কবি গোবিন্দদাস যৌবনের

প্রথমাংশ পর্য্যন্ত, রাজগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কিশোর গোবিন্দে প্রতিভার বীজ নিহিত আছে বুঝিতে পারিয়া, বৃদ্ধ রাজা তাঁহাকে পুত্রতুল্য স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন।

ভাওয়ালের রাজগৃহে অবস্থান কালে দাসকবির মধ্যে জাতীয় ভাব অঙ্কুরিত হয়।

নির্ঝরিণী যেমন ভাবে পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া স্বতঃ উৎসারিত হইয়া থাকে, কবি গোবিন্দের দেশাত্মবোধ তেমনি ভাবে বিকশিত হইয়াছিল তাঁহার দেশপ্রীতি জন্মগত। দরিদ্র গৃহে জন্মিয়াও যে দুর্জ্জয় তেজস্বিতা এবং আত্মমর্য্যাদা আবাল্য তাঁহার হৃদয়ে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, তাহাই যৌবনে দেশপ্রীতির আকারে পরিণতি লাভ করে। এক দিকে কবি গোবিন্দদাস যেমন সাধারণ ভাওয়ালবাসীর ন্যায় জনসাধারণের সঙ্গে সমভাবে মিশিয়া, তাহাদের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন; অপর দিকে তেমনি ভাওয়াল রাজগৃহে প্রতিপালিত হইয়া রাজসভার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি তদানীন্তন রাজা প্রজার সম্বন্ধ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন।

রাজা কালী নারায়ণ একজন মহামনা নরপুঙ্গব ছিলেন। প্রজা পালনে দক্ষতা, দরিদ্র এবং অসহায়ের প্রতি অপরিসীম করুণা ও ন্যায় বিচার স্পৃহা তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গে লোকবিশ্রুত করিয়াছিল। জনসাধারণের নিকট তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন।

ভাওয়ালের সেই সুবর্ণ যুগে কবি গোবিন্দদাসের স্বদেশ বাৎসল্য গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছিল। তিনি ভাবিতেন, ভাওয়ালের সমৃদ্ধি সম্পদ ও রাজশ্রী যেন দিন দিনই চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে,- ভাবিতেন, রাজার সঙ্গে প্রজার সহযোগিতায় যেন দেশের উন্নয়ন হয়; ভাবিতেন, রাজসভার আনুকুল্যে দেশের দুঃখ যেন দূরীভূত হয়। এই ভাবে তাঁহার প্রাণে সুপ্ত দেশাত্মবোধের বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে। যে স্বরাজ লাভের জন্য ভারতবর্ষ অস্থির, প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে, সেই স্বরাজের স্বপ্ন, একজন অজ্ঞাতপল্লী যুবক কবির হৃদয়ে কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ভাওয়ালের সেই রাম রাজত্বের সময় ২২ বৎসরের যুবক কবি লিখিয়াছিলেন;—

"আমরাই হ'ব সচিব প্রধান,
আমরাই হ'ব দ্বারে দ্বারবান,
আমরাই হ'ব বণিক কৃষাণ,
তাঁতি, কর্ম্মকার, আমরা সেহ;
আমরা মারিব সহিব ভাইরে,
এতে অপমান কিছুই নাইরে,
আমরা বেচিব, আমরা কিনিব,
আমাদের টাকা আমরাই পাব,
লইতে নারিবে কড়াটি কেহ।"

কিন্তু কবি যে সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা আর সফল হইল না। বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের চেষ্টায় তাঁহার জীবনের সমস্ত আশা—আকাঙ্ক্ষা, সুখ শান্তি, কাল বৈশাখীর বাতাহত কদলীর মত অকালে নির্ম্মূল হইয়া গেল।

১২৮৫ সনে ভাওয়ালের বর্ষীয়ান্ রাজার অকস্মাৎ মৃত্যু হইলে সমগ্র দেশে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিল। স্বর্গীয় 'বান্ধব" সম্পাদক ও "প্রভাত চিন্তা", "নিভৃত চিন্তা" প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নিচয়ের প্রতিভাশালী লেখক, কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তখন রাজার মন্ত্রী ছিলেন। কবি গোবিন্দদাস তখন রাজার পার্শ্বচর কর্ম্মচারী। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। ফলে, অনাচার—অত্যাচারের অগ্নিশিখা সমগ্র দেশকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেশে নানারকম পৈশাচিক যজ্ঞের সূত্রপাত হইতে লাগিল। ভাগ্য দেবতার কোপে, দেশ জুড়িয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। স্বেচ্ছাচারী রাজসভার ইঙ্গিতে রাজ্যের শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইল। প্রজামণ্ডলী ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া কালকর্ত্তন করিতে লাগিল।

এই দুঃসময়ের অল্পদিন পূর্ব্বে,—নারী সম্পর্কিত ব্যাপারে, জনৈক অপমানিত ও লাঞ্ছিত প্রজার অভিযোগ রাজার নিকট উপস্থিত হইল, এবং দাস কবি তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন; কারণ রাজা বা রাজ-সভা সেই অভিযোগের কোনই সুবিচার করিলেন না। ইহাতে কবির আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইল। তেজস্বী কবি ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া—নিজ ভবিষ্যতের পানে না চাহিয়া—স্বেচ্ছায় রাজগৃহের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া লিখিলেন,

"ন্যায়ের পবিত্র বক্ষে করি পদাঘাত
অকালে সে দিন হায় করি চুর চুর,
পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি মাগো অকস্মাৎ
ভেঙ্গেছে সৌভাগ্য মোর সোণার মুকুর!
কিন্তু—
এতেও সুখের নাহি ছিল পরিসীমা
মুছিত যদি মা তোর কলঙ্ক কালিমা!"

তারপর নিদারুণ, নিরন্ন অবস্থায় নিপতিত হইয়া প্রাণাধিকা পত্নী সারদাসুন্দরী ও একমাত্র শিশু কন্যাকে অনাচার দগ্ধ ভাওয়ালে, একাকী ফেলিয়া, বিদেশে উদরান্নের চেষ্টায় বহির্গত হইলেন।

সারদা সুন্দরী কবির যোগ্যা পত্নী ছিলেন। তাঁহারও আত্মসম্মান জ্ঞান তীব্র ছিল। তৎকালীন্ গৃহ চিত্র, কবি এমন করুণ মর্ম্মভেদী ভাষায় লিখিয়াছেন যে, পড়িলে হৃদয়ে সমবেদনা জাগিয়া উঠে। একটু নমুনা দেখুন,—

"অভাগিনি অশ্রুমুখি দুখিনি আমার
যেওনা কাহারো কাছে, অবহেলা করে পাছে,
গরবিনী প্রতিবেশী দেখি কদাকার!
পরের কথাটি হায় সহেনা কোমল গায়
এত তীব্র তেজোরাশি হৃদয়ে তোমার!
নাহি ঘরে মুষ্টি অন্ন, তবু নহে অবসন্ন,
শমন শঙ্কিত যেন বীরত্বে তোমার!
সেই ভিখারিণী বেশ, শরীর কঙ্কাল শেষ,
সে পবিত্র আত্মহত্যা—মহান্—উদার!
প্রিয়ে দুখিনি আমার!—
প্রাণপণে অবিরত, যতন করিনু কত
মুছিতে পারিনু কই শোকাশ্রু তোমার!
শত গ্রন্থি ছিন্নবাস, একাহার উপবাস,
এ জনমে অভাগিনি ঘুচিলনা আর!"

* * * *

এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় যখন তিনি বিদেশ গমনোন্মুখ, তখনও তাঁহার প্রাণে প্রবল দেশ-প্রীতি জাগিতেছিল। স্বদেশবাসিগণের অজ্ঞতা ও মোহান্ধ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, স্বকীয় দৈন্য ও দুর্দ্দশা বিস্মৃত হইয়া তাহাদের জন্য কাতরতা প্রকাশ করিয়া লিখিলেন,—

"প্রিয়তম জন্মভূমি! এ ক্ষুদ্র হৃদয়
জীবন্ত চিতায় কেন করি ভস্মময়!
হে প্রিয় স্বদেশবাসী, কেন বহ্নি রাশি রাশি,
প্রত্যেক নিঃশ্বাসে করে জীবন সংশয়;
জানিবে কি? জান না কি এ পোড়া হৃদয়,
তোদেরই সুখের লাগি, হয়েছি সংসার ত্যাগী,
ভুলিয়াছি প্রেয়সীর সরল প্রণয়,
করিয়াছি অভাগীরে চির ম্লানময়!
হে প্রিয় স্বদেশবাসী, তোমাদেরি তরে,
ভুলিয়াছি জীবনের প্রিয় সহোদরে!
স্নেহময় পরিবার, করিতেছে হাহাকার,
সহিতেছি এ যাতনা অম্লান অন্তরে;

তবু মূর্খ জ্ঞান নাই,
যা' কহ তা কহ ভাই !
অতুল আনন্দে প্রাণ ডগমগ করে
স্বর্গীয় সৌরভ যেন উছলিয়া পড়ে !"

কবির এই ভাবোচ্ছ্বাস কাল্পনিক নহে—খাঁটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কবি প্রাণের শাশ্বত ব্যাথা—মুখের কথা নহে। তাঁহার সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী জানিলে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁহার জন্মস্থানের জন্য কত বড় স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন! কেমন করিয়া দানবী শক্তি মনীষার বিল্বমূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল, এস্থলে বিস্তৃতভাবে সে কাহিনীর উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। গোবিন্দদাস স্বেচ্ছায় পথে বসিয়াছিলেন—তিনি খলাত সলিলে না ডুবিলে পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহাকে উদরান্নের জন্য ভাবিতেই হইত না। মনুষ্যা তাঁহাকে এই পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

কবি গোবিন্দদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিবার সুযোগ করিতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহার মন দাসভাবাপন্ন ছিলনা, এবং তেজস্বিতা, নির্ভীকতা ও স্বাধীনতা স্পৃহা প্রভৃতি মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক গুণাবলী তাঁহার মধ্যে বিকশিত হইয়াছিল।

শুনিয়াছি, বন্যহস্তীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলে, প্রথম কয়েকদিন সে বৃক্ষ অথবা প্রাচীর প্রভৃতিতে মাথা ঠুকিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে। মানুষের চিত্তেও প্রাকৃতিক এই প্রেরণা রহিয়াছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দীক্ষার ফলে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আধুনিক কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনায় গোবিন্দদাস বিদ্বান্ না হইতে পারেন, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে তাঁহার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

দাসকবি, রাজগৃহের সমস্ত ত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেও মন্দ ভাগ্য তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। তিনি বড়ই পত্নীপ্রেমিক ছিলেন, এজন্য তীব্র বিরহানলে তপ্ত হইয়া প্রায়ই স্ত্রীর সঙ্গে মিলিতে হইতে দেশে আসিতেন, কিন্তু, এই স্বর্গসুখ তাঁহার ভাগ্যে বেশী দিন রহিল না। কবিপত্নী সারদা সুন্দরী প্রস্ফুটিত যৌবনে, বৃন্তচ্যুত শেফালিকার মত অকালে ঝরিয়া পড়িলেন। পূর্ব্ববঙ্গে সারদাসুন্দরীর মৃত্যু সম্বন্ধে নানারকম জনশ্রুতি বিদ্যমান রহিয়াছে। শুনা যায় যে, তাঁহার মৃত্যু একটা মর্ম্মভেদী বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, সে সকল আলোচনার এ স্থান নহে। আপনারা ইচ্ছা করিলে, ১৩২৫ সালের পৌষ সংখ্যা "নারায়ণ" কাগজে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় লিখিত "সুরদাস" নামক উৎকৃষ্ট গল্পটী পাঠ করিয়া দেখিবেন।

পত্নীবিয়োগের পরও তিনি মাসে মাসে জন্মভূমিতে—সারদার চিতামূলে, দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিতে আসিতেন। পত্নীবিরহের তীব্র বৃশ্চিক দংশন প্রাণে প্রাণে পোষণ করিয়াও, তিনি ভাওয়ালের প্রজাগণের অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেন—তাঁহাদের লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেখিয়া, তিনি ব্যথার উপর ব্যথা পাইতেন—বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে নিষ্পেষিতপুচ্ছ সর্পের মত যাতনা অনুভব করিতেন। যদিও জাতীয় কলঙ্ক দূরীভূত করিতে তাঁহার তখন কোন ক্ষমতাই

ছিলনা, তথাপি এমন একজন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তথায় গমনাগমন করে, রাজসভার নিকট ইহা নিতান্ত অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়াইল। যাঁহারা বিস্মার্কের অথবা চাণক্যের মত প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধি রাখেন, তাঁহারা কবি গোবিন্দচন্দ্রের মত লোকের ছায়া মাড়াইতেও দ্বিধা বোধ করেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে একটা বিশ্রী ষড়যন্ত্র গঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ফলে, দুষ্ট গ্রহের বিড়ম্বনায়, কবি গোবিন্দদাস অকস্মাৎ, ১২৯৮ সালে ভাওয়াল রাজসভার কোপানলে নিপতিত হইয়া জন্মের মত জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। বাঙ্গালার কোন সাহিত্যিকের অদৃষ্টে এমন বিধি বিড়ম্বনা কখনও ঘটিয়াছিল বলিয়া শুনা যায় না।

রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিবার সময় "বিশ্বাস ঘাতক" বলিয়া কটুক্তি করেন। যে ন্যায় ও সত্যের জন্য তিনি অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার অমর্য্যাদা কবির প্রাণের ভিতর আঘাত করিল। মহাসাগরে বাড়বানল উদ্গত হইল। কবি গোবিন্দদাস ঐ কথার কি প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। -

"বিশ্বাসঘাতক!" আমি বিশ্বাসঘাতক?
কাঁপিল বিদ্যুদ্‌বেগে আপাদ মস্তক!
মুহূর্ত্তের তরে কিরে, কেশাগ্র না নড়ে শিরে
মুহূর্ত্তের তরে শান্ত প্রচণ্ড পাবক,
গর্জ্জে না তরঙ্গ-শঙ্খ মূর্ত্তি সংহারক!
আবার মুহূর্ত্ত পরে, বুঝি জনমের তরে
জ্বলিল কালাগ্নি—ঘোর জীবন্ত-নরক!—
আগের সহস্র তেজে—হৃদি অঙ্গারক!

*   *   *   *

'বিশ্বাসঘাতক"—মূর্খ! কি বলিব আর
হৃদয় শোণিত কিরে বিনিময় তার?
আত্মপর নাহি জ্ঞান
দেবতার কুসন্তান
চিরিয়ে দিয়েছি বুক পূজায় তোমার
নিরেট নির্ব্বোধ! মর্ম্ম বুঝিলে না তার?
নিষ্ঠুর! ছিল না তব অন্য সম্বোধন?
শত তিরস্কারে তব উঠিল না মন?
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা ধরি, যদি বক্ষভেদ করি
হৃদয় শোণিতে কর বিধৌত চরণ,
বড় সুখ! কৃতজ্ঞতা ব্রত উদ্‌যাপন!
লভিতে মনের সুখ, কুকুরে দংশাও বুক

জল্লাদে এখনি কণ্ঠ করুক ছেদন,
বড় সুখ ! কৃতজ্ঞতা ব্রত উদ্‌যাপন !
নির্ব্বোধ ! নাইরে তোর হৃদয়ের বল,
নির্ব্বোধ ! নাইরে তোর কিছুই সম্বল ;
কার হাতে ভাত খাও, কার বা নয়নে চাও
জানিনা অদৃষ্টে তোর আছে কিবা ফল !
ভবিষ্য ভাবিয়া তাই আসে অশ্রুজল !
এমন বিশ্বাস অন্ধ, জ্ঞান নাই ভাল মন্দ
বালকের ক্রীড়নক—মাটির পুতল,
সৃষ্টির অপূর্ব্ব জীব—বিধির কৌশল !

আমার প্রভুর বংশে, আমার প্রভুর অংশে
যদি না জন্মিতি তুই ;—তবে কিরে ঝরে
এ নয়নে অশ্রুরাশি চিরকাল তরে !
হা মাতঃ মা জন্মভূমি, মৃগেন্দ্র মহিষী তুমি,
জীবিত মৃগেন্দ্র শিশু নয়ন উপরে
শৃগাল কুক্কুরে তোরে উপভোগ করে।”

কবি প্রাণের এই যে দুর্দ্দমনীয় দুঃখ অনেকেই জানিতে পারেন নাই। ৪০ বৎসরের পুরাতন জীর্ণ পত্র-পুটে আজিও সেই দুঃখের কথা লিখিত রহিয়াছে। কবিতাটীর শেষাংশ টুকু আমরা নানা কারণে উল্লেখ করিতে পারিলাম না। এই রচনায় গোবিন্দদাসের মনের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। ইহা দ্বারা আপনারা হয়ত বা দাস কবির কতক স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

নির্ব্বাসিত হইবার পর অনল গর্ভ পর্ব্বতের রুদ্ধ মুখ বিদীর্ণ হইল, এবং তাহা হইতে জ্বালাময়ী গৈরিক নির্ঝর প্রবাহিত হইতে লাগিল। অগ্নিময় প্রস্তর খণ্ড সকল নানা আকারে বিচ্ছুরিত হইয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন করিতে লাগিল।

নির্ব্বাসিত কবি কহিলেন,—

“ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান !
কণ্ঠেতে শোভিছে তার, চিলাই মুকুতা হার
রজত ধবল ধার সদা বহমান !

তারি তীরে হায়, হায়, শোভে মধ্যমণি প্রায়
সারদার প্রমদার প্রেমের শ্মশান!
আহা, তার নরনারী, ফেলে যে আঁখির বারি,
অবিচারে ব্যভিচারে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
বারমাস তের কাতি, দিনে রেতে সে ডাকাতি
বুকে বিঁধে সদা মোর শেলের সমান!
বুকের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে,
যদি তার দুঃখ নিশি হয় অবসান,
আপনি ধরিয়া ছুরি, আকণ্ঠ হৃদয়ে পুরি,
কলিজা কাটিয়া দেই করি শতখান্!
তাহার মঙ্গল হিতে, যদি আসে বাধা দিতে
লইয়া ভীষণ অস্ত্র বাসব ঈশান,
পদাঘাতে পদাঘাতে, দেই তারে অধঃপাতে,
চরণ ধূলির সম নাহি করি জ্ঞান।
পাঁচটী বছর যায়, যদিও দেখিনা তায়
যদিও অনেক দূর—আছি ব্যবধান,
তথাপি করেছি পণ, এই রক্ত এ জীবন,
সাধিতে তাহারি হিত—তাহারি কল্যাণ,
আমি তার নির্ব্বাসিত অধম সন্তান।"

আপনারা লক্ষ্য করিবেন, জন্ম স্থানের প্রতি কবি গোবিন্দদাসের প্রীতি কেমন করিয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এবং অবশেষে কি সূত্রে তাঁহার লেখনী হইতে নিতান্ত কটু এবং মর্ম্মভেদী ভাষা বিনির্গত হইত।

নির্ব্বাসিত কবি দেশবাসিগণের নিকট কি অভিযোগ করিতেছেন শুনুন,—

"তোমরা বিচার কর আমারে যাহারা,
করিয়াছে নির্ব্বাসিত,
করিয়াছে বিড়ম্বিত,
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয়দেশ ছাড়া,
পথের ভিখারী করি,
করিয়াছে দেশান্তরী,
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা।
গোষ্ঠি গোত্রে যার যুটে,
জন্মভূমি নেয় লুঠে,

ভয়ে নাহি কথা কয় দেশী অভাগারা,
যারা ভাই বস্ত্র হরে
দিনে রেতে ঘরে ঘরে,
আকুলা জননী বোন্ কেঁদে হয় সারা,
তোমরা বিচার কর—কে হয় তাহারা !
তারা নহে দস্যু চোর, দুর্দ্দান্ত দানব ঘোর ?
পিশাচ রাক্ষস ভাই, তাহারা কি নয় ?
আমি সে দেশের অরি,
চরণে বিচূর্ণ করি,
যদি পাই, দিবানিশি এই মনে লয় !
বাঙ্গলার নর নারী,
এই শোন শোন তারি,
কি যে সে গগনভেদী গভীর চীৎকার !
যে জাতি যেখানে থাক,
সতীর সতীত্ব রাখ,
আপনার মা বোনেরে স্মর একবার !
পেয়েছ যে প্রাণ, হস্ত,
পুণ্য কার্য্যে কর ন্যস্ত,
কর সমুচিত তার সাধু ব্যবহার
উৎপীড়িত-প্রপীড়িত ভাওয়াল উদ্ধার !"

তারপর, দেশবাসীদের প্রতি কবির বিশ্বাস কি অটুট,—

"সংসারে আমার ভাই
যদিও কেহই নাই
তবুত তোমরা আছ দেশবাসিগণ ?"

কিন্তু কবির এই কাতর কণ্ঠের বিলাপ, সেকালে কাহারও—প্রাণস্পর্শ করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায় না।

অতঃপর কবি, দেশবাসিগণকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়াছেন ;—

"সত্যই কি বঙ্গদেশ
ভরা শুধু ছাগ মেষ,
এখানে মানুষ নাহি—জন্মে কদাচন ?

নহ ত একটী দু'টী,
বঙ্গবাসী আট কোটী,
সকলে কি কাপুরুষ অধম এমন?"

অবশেষে, বাঙ্গালী জাতিকে অনায়াসে, এতদপেক্ষাও তিক্ত ভাষায় তিরস্কার করিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

"বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়?
এমন অধম জাতি,
বুকে মার শত লাথি
মুখে মার শত ঝাঁটা অনায়াসে সয়!
মেড়ার ডলিলে কাণ,
সেও করে অভিমান,
সে-ও এসে মারে ঢুস্, নাহি করে ভয়;
এগুলো মেড়ার মেড়া,
ছাগলের লোম ছেঁড়া,
কুকুরের চেয়ে বেশী পদাঘাত সয়!
নাহি বীর্য্য নাহি তেজ,
উদরে গুণ্ঠিত লেজ,
বিলুণ্ঠিত পরপদে সকল সময়!
অধম পিশাচগুলি
গর্দ্দভের পদধূলি,
মাথায় মাখিয়া ছিছি, বড়লোক হয়
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়?
এই যে ভাওয়ালবাসী
নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,
অবিচারে ব্যভিচারে ভস্মীভূত হয়,
কে করে তাহার খোঁজ
অসুরেরা রোজ রোজ,
কত যে কুলের বধূ চুলে ধরি লয়!
কত যে জননী বোন্,
কাটিয়া ঘরের কোণ
চুরি করে পিশাচেরা নিশীথ সময়।

এরা আহা চক্ষু খেয়ে
একটু দেখেনা চেয়ে
ইহাদেরি একদেশী প্রতিবেশী হয় !
জুতা, লাথি, ঝাঁটা বেতে,
এরা না কিছুতে চেতে,
অচেতন জড়ে কবে ব্যথা বোধ হয় ?
দেও তারে শত গালি,
দেও গালে চুণকালি
বেহায়ার তাতে কিবা লোক লাজ ভয় !
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয় ?"

ইহার পর অকুতোভয়ে, কবি গোবিন্দদাস, "মগের মুলুক" নামক একখানা তীব্র ব্যঙ্গকাব্যে, ভাওয়ালের অনাচার অত্যাচারের রোমাঞ্চকর সত্যঘটনা সকল, জ্বলন্ত আগ্নেয় ভাষায় বর্ণনা করিয়াছিলেন। "মগের মুলুক" লিখিবার পর তাঁহার কবিখ্যাতি পূর্ব্ববঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

নিজে নিষ্পেষিত না হইলে, কোনও কবির লেখনী হইতে, ভীষণ জনাপবাদ পরিপূর্ণ অগ্নিময় এবং প্রাণস্পর্শী কাব্যোচ্ছ্বাস বিনির্গত হইতে পারেনা। স্বার্থ সাধনের জন্য মানুষ কতদূর জঘন্য পৈশাচিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে, "মগের মুলুক" পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধি হয়।

ভবিষ্যৎ জীবনে, প্রবল দেশাত্মবোধ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। অত্যাচার জর্জ্জরিত ভাওয়ালের চিত্র, তিনি পরবর্ত্তী জীবনে সমগ্র দেশের ভিতর ধ্যাননেত্রে দর্শন করিতেন। বিশাল বঙ্গদেশে অবস্থিত, কত কত জনপদ যে অত্যাচার অনাচারের লীলাক্ষেত্র সে কথা সর্ব্বদাই তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিত।

কবি গোবিন্দদাস অকুতোভয়ে ভারতের রাজা জমিদার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ ভাওয়ালের উচ্ছৃঙ্খল শাসন-কর্ত্তার চিত্রটী চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া তিনি ইহা লিখিয়াছিলেন :—

"ভারত করিল ভস্ম রাজা জমিদার !
অই যে কাস্তারে ক্ষেতে, খাটে চাষা দিনে রেতে,
নাহি বৃষ্টি, নাহি রৌদ্র নাহি নিদ্রাহার,
ইন্দিরা অন্নদা রূপে, যবে ওর শস্য স্তূপে
ঢালিবেন সুখশান্তি করুণা সম্ভার,
করিয়া কতই আশা, আনন্দে উল্লাসে চাষা,

দেখিবে যখন সেই শ্রমফল তার,
খাজানার ছল করি, তখন লইবে হরি,
অভুক্ত প্রজার সেই মুখের আহার !
সারাটা বছর হায়, রোগে শোকে যন্ত্রণায়,
অর্দ্ধাহারে অনাহারে দীন পরিবার।
কেহবা শ্মশানে শোবে, কারে বা কবরে থোবে
শিয়াল শকুনী কারে করিবে সৎকার ;
ভারত করিল ভস্ম রাজা জমিদার !
নিজে করে বাবুগিরি, চাহিয়া দেখেনা ফিরি
এদিকে যে করে তারে কাবু ম্যানেজার !
শুধু করে দস্তখৎ, কলের পুতুলবৎ
দিনে দিনে হতভাগা ঋণে ছারখার !
সে নেয় টাকার তোড়া, তারে দেয় গাড়ী ঘোড়া,
ইডেন্ গার্ডেন আর মদের ইয়ার !
সে নেয় লুঠিয়া দেশ, প্রজার কষ্টের শেষ
এ এদিকে মজা লুঠে—দেখে থিয়েটার !
দার্জ্জিলিঙ্গে সিমলায়, ওরা দেখ হাওয়া খায়
এ এদিকে খায় বসে পরকাল তার।
সে ফিরে অলক্ষ্মী নিয়া, রাজলক্ষ্মী তারে দিয়া
রাজশক্তি রাজমান আর রাজ্যভার,
হেমন্ত কুহেলী অন্ধ, নাহি বোঝে ভালমন্দ
শূয়রে সঁপিয়া দেয়—পদ্মবন তার
ভারত করিল ভস্ম রাজা জমিদার !"

তাঁহার দেশভক্তিমূলক কবিতায় সমগ্র জাতীয় জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয়—সেই জাতীয়তা, জীবনের অনুভূতিসঞ্জাত। পল্লীজীবনের দুর্দ্দশা হইতেই তাঁহার প্রাণে দেশের জন্য সমবেদনা জাগিয়াছিল। বাড়বানলের মত তাঁহার অভ্যন্তরে দেশপ্রীতির যে বীজ নিহিত ছিল, শেষ জীবনে সে বহ্নি দিবানিশি জ্বলিত। সে অনলে ভীরুর চৈতন্য জন্মে—মৃতকল্প মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড স্পন্দিত হয়।

ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখে যাঁহার কবিতার আরম্ভ, সমগ্র ভারতের দুঃখে তাহার পরিণতি। ঘনকৃষ্ণ জলদগত নিহিত বিদ্যুতের মত, আজীবন তিনি সেই দুঃখের আগুন পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

ভারতের জাতীয় অবস্থার চিত্র বর্ণনা করিতে স্থানে স্থানে তিনি যেরূপ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে পাঠকের মন বিমুগ্ধ হইয়া যায়। এস্থলে দাস কবির একটী ক্ষুদ্র কবিতা উল্লেখ করিব।

"ভারত সৈরিন্ধ্রী বেশে আছে বিরাটের ঘরে,
দুর্ভাগ্য পাণ্ডব পঞ্চ তাহারি দাসত্ব করে।
নাহি মান অপমান, নাহি যে কর্ত্তব্য জ্ঞান,
নহে সে পাণ্ডব যেন, আছে দাস চিরতরে!
রাজদণ্ড পরিহরি, আছে ছদ্মবেশ ধরি,
কুলের কলঙ্ক কঙ্ক ভাবেনা কি হবে পরে!
ত্যজিয়ে গাণ্ডীব ধনু, আবরিয়ে বীর তনু
নারীবেশে বৃহন্নলা—ভাবিতে প্রাণ শিহরে!
কেহ আছে অশ্বপাল, কেহ বা আছে রাখাল
নাহিরে চৈতন্যবোধ—সূপকার বৃকোদরে!
পরগৃহে পরাধিনী! সৈরিন্ধ্রী ভারত রাণী
কীচকের অত্যাচারে নিয়ত কাঁদিয়া মরে।"

কবি গোবিন্দদাস স্বাধীনতার জন্য সাধনা করিতেন—অবসর পাইলেই বাঙ্গালীকে স্বাধীনতার বাণী শুনাইতেন। নিজের একটী কন্যার নাম পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রাখিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাস প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যখন ৺রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত "বীণা" নাম্নী কবিতা প্রসবিনী পত্রিকায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা লিখিতেন, তৎকালে "কবিকাহিনী", "রুদ্র চণ্ড", "ভগ্ন হৃদয়" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন।

"বীণায়" "প্রকাশিত" "দুর্গোৎসব" উপলক্ষে রচিত গোবিন্দচন্দ্রের একটী কবিতার একাংশ এস্থলে উল্লেখ করিব। ইহাতেও আপনারা তাঁহার প্রকৃত মনস্তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন।

"বৎসরের যত দুঃখ এই তিন দিন
অভাগা ভারত তুমি ভুলিবে নিশ্চয়;
পর পদাঘাত সহ চির পরাধীন—
ভারতে স্বাধীন প্রাণ তিন দিন রয়।
ভীরু কাপুরুষ চির সাহস বিহীন—
বাঙ্গালীর হাতে খড়্গ এই তিন দিন!

এই দিন ভারতের কত পুণ্যময়
স্বাধীন শশাঙ্ক হাসে পূর্ণ নিরমল।
স্বাধীন-মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তি—দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময়
উজলে অনন্ত দূর সাগরের তল।
স্বাধীন মলয়ে ধীর শীত সমীরণ,
যেখানে সেখানে সুখে বেড়িয়া বেড়ায়;
স্বাধীন কুসুম হাসে—লতার যৌবন।
স্বাধীন তারকা ফোটে আকাশের গায়!
ক্ষুদ্রতম বালুকণা—উচ্চ হিমালয়,
অনন্ত প্লাবনে যদি অনন্ত সময়
ভাসায় ভারত বক্ষ ক্ষতি কি তায়?
অষ্টাদশ কোটি এই ভারত তনয়
দুর্ভিক্ষ রাক্ষস যদি চিবাইয়া খায়,
দুঃখিনী ভারত ভূমি! কি বলিব আর—
একটী তণ্ডুল কণা, একটী সন্তান
থাকে যদি অবশিষ্ট, জননি তোমায়
অম্বিকার পদে দিও শেষ বলিদান!
সবিনয়ে জিজ্ঞাসিও সারদার কাছে
দুঃখের তামসী-নিশি কত দিন আছে?"

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কবি গোবিন্দদাস বাঙ্গালী জাতিকে সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন:—

"এস ভাই ভিন্নভাব করি পরিহার,
এস ভাই এক প্রাণে, এক ধ্যানে এক জ্ঞানে,
অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার!
রাখি এ অনন্ত হস্ত, সে কার্য্য সাধনে ন্যস্ত,
পবিত্র মহান্ সত্য করিতে উদ্ধার।
(এস) অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার।"

পরবর্ত্তী জীবনে, এই নিশ্চেষ্ট অথচ মুখ-সর্ব্বস্ব জাতির, প্রকৃত ভ্রাতৃভাবের পরিবর্ত্তে নিস্ফল আন্দোলনের আতিশয্য দেখিয়া, ১৩১৪ সনে ঘৃণার সুরে লিখিয়াছিলেন,—

"স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছিস্ কারে এদেশ তোদের নয়,
কার স্বদেশে কাদের খেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে

জোর জবরে গাড়ীর ভিতর সাড়ী কেড়ে লয় ?
নপুংসকের গোষ্ঠি তোরা, জন্ম অন্ধ কাণা খোঁড়া,
ভিস্তিওয়ালা পাঙ্খাকুলী পিলা ফাটার ভয়
কার স্বদেশে সর্ব্বনেশে এমন অভিনয় ?”

মহাত্মা গান্ধী যে ত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, দীন কবি গোবিন্দদাস সেই ত্যাগের আদর্শে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিলাসিতার প্রতি আশৈশব তাঁহার বীতরাগ ছিল। যে বিলাসিতা বর্জ্জনের জন্য আজকাল চারিদিকে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে, সেই কথাটা ১৩০১ সনে তিনি বাঙ্গালীকে সুকৌশলে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,—

“কার্ত্তিক! তুমি কি সেই দেব সেনাপতি ?
তোমারে পূজিলে মেলে, তব সম বীর ছেলে,
সে নাশে তোমারি মত দেশের দুর্গতি ?
সে ফেলে সজোরে ছিঁড়ি, জননীর দাসীগিরি,
তাহারো কি পদভরে কাঁপে বসুমতী ?
তারো কি হিমাদ্রি লঙ্কা, বাজে সে বিজয় ডঙ্কা,
তাহারো চরণে বিন্ধ্য করে কি প্রণতি ?
হায় সে ছেলের লাগি, সারারাত জাগি জাগি
করে কি তোমার পূজা যত কুলবতী ?
ছাড়িয়া বীরের সাজ, আসিতে হ'ল না লাজ,
তোমারো এখানে এসে ফিরে গেল মতি ?

* * * * *

এ বেশে তোমারে পূজি, কি ফল আমি না বুঝি,
জন্মে শুধু কতগুলি পাপ জড়মতি ?
পরিচ্ছদ ফুল কোঁচা, ব্যবসা পেনের খোঁচা
পদাঘাতে পীলা ফাটা—এই শেষ গতি!
যাহা কিছু উচ্চ শিক্ষা, উদ্দেশ্য দাসত্ব ভিক্ষা
ছোট বড় সকলের একই পদ্ধতি!”

* * * * *

আবার ১৩২৪ সালে—মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে লিখিলেন,—

“বিলাসে বাঙ্গলা ভাসে অধঃপাতে যায়!
ঘরে নাহি মুষ্টি অন্ন, অনশনে অবসন্ন
বিকাইয়া ভিটা মাটী গেছে ঋণ দায়!

তথাপি অটো ডি রোজ, মাথা চাই রোজ রোজ
পিয়ারের প্রিয় সোপ্ মাখা চাই গায় !

* * * * *

বিলাসে বাঙ্গলা ভাসে—রসাতলে যায় !
পথের মজুর কুলি, অভুক্ত সন্তান ভুলি
চায়ের পেয়ালা পিয়ে প্রভাতে সন্ধ্যায় !
রোজ সিগারেট ছাড়া ধূম নাহি পিয়ে তারা,
কে জানে ইহার বাড়া পতন কোথায় ?
সৌরভে ব্যাকুল বঙ্গ—বিলাসে বিহ্বল,
ভিখারীর ভাঙ্গা ঘরে, লেস পেড়ে সাড়ী পরে,
সেমিজে কামিজে, গাউনে উড়ে পরিমল,
সুগন্ধি আল্‌তা পায়, ফোটে যেন আঙ্গিনায়
শরত প্রভাতে হায় রক্ত শতদল !
এ পরী পোষিতে গিয়া, কত ঘর দেউলিয়া,
নীরবে নিশীথে ঝরে কত অশ্রুজল,
সৌরভে ব্যাকুল বঙ্গ—বিলাসে বিহ্বল !

* * * * *

বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ -মোহে অচেতন
চাহিয়া দেখেনা পাছে. কত নীচে নামিয়াছে,
কোথা হতে হইয়াছে কোথায় পতন !
ব্যাপিয়া সারাটা বঙ্গ, কেবলি কামের রঙ্গ,
তাহারি ঔষধ খোঁজে—তারি বিজ্ঞাপন !
এ নহে কুৎসিৎ কথা, এত নহে অশ্লীলতা,
এ যে গো জাতির এক বীভৎস মরণ !'

* * * * *

তাঁহার এক একটী কবিতা, পরম রমণীয় চিত্রের মত, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার ছবি চক্ষুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। পরাধীনতায় ভারতের কি শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতে বসিয়া, তিনি আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন ;—

"রাখ মা ভারতবর্ষ যায় রসাতলে
বাণিজ্যে নাহি মা মতি, দিন দিন অধোগতি,
একটী শ্রীমন্ত আর যায় না সিংহলে !
শুধু যায় কর্ম্মদোষে, 'অষ্ট্রেলিয়া মরিশসে,

আপনা বেচিতে যায় কুলি দলে দলে ;
বেচিয়া চুরুট পান, অষ্টাদশ কোটি প্রাণ
বাঁচিতে পারে কি বল—কত দিন চলে ?"

যে কবি গোবিন্দ দাস একদিন পূর্ণ যৌবনে, সারদাসুন্দরীর প্রেমে নিমজ্জিত হইয়া, স্থূল প্রকৃতির মধ্যে মগ্ন হইতেন এবং আত্মহারা হইয়া প্রণয় প্রসঙ্গে গগনের চন্দ্রকে বলিতেন ;—

"তুমি কিহে সেই চন্দ্র সে দিন কি ছিলে ?
আমতলে চুমো খেতে তুমি দেখেছিলে ?
* * * * *
চাহে সে আমারে যেন করিবারে পান
উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা তার করিতে নির্বাণ!
মদ্দিয়া মথিয়া মোরে লুঠিয়া সে নিলে,
আমতলে চুমো খেতে তুমি দেখেছিলে।"

সেই কবি গোবিন্দ দাস, একদিন দেশ প্রেমে আবিষ্ট হইয়া সেই চন্দ্রকেই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, –

"কি তরে কঠিন এত হ'লে শশধর ?
আহা হা ভারতভূমি, কি করে দেখিয়া তুমি
ধৈরয ধরিয়া আছ কাঁদে না অন্তর ?
যে দেশের বসুন্ধরা, গোলকুণ্ডা হীরাভরা,
বহিছে কনক রেণু পর্ব্বত নির্ঝর!
যে দেশে তোমার মত, ওঠে শশী শত শত,
ইন্দিরা অমৃত সহ মথিলে সাগর!
সেই দেশে হায় হায়, সন্তান চিবায়ে খায়,
ক্ষুধার্ত্ত জননী নিত্য পূরিতে উদর!
বল শুনি কোন্ প্রাণে, চেয়ে সে মায়ের পানে
কি করিয়া এত হাসি হাস শশধর,
নর দুঃখে অমর কি হয় না কাতর ?"

তারপর দেশের দুঃখের প্রকৃত চিত্রপট খুলিয়া কবি দেখাইতেছেন :—

"দুঃখ দরিদ্রতা ভরা, দেখ নাকি বসুন্ধরা
নানা রোগে শোকে হেথা ক্লিষ্ট কলেবর!
কাঁদে কত পুত্রহীনা, ভগিনী সোদর বিনা,
দিবানিশি বিধবার নয়নে নির্ঝর!
বিড়ম্বিত মোর মত, আছে হতভাগ্য কত,

প্রাণভরা ধূ ধূ করে মরু ভয়ঙ্কর!
ইহা দেখি নিত্য নিত্য, না হয় ব্যথিত চিত্ত
বসন্তের হাওয়া খেয়ে বেড়াও নাগর ?"

আবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা—মানবের অধঃপতনের কাহিনী সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিলেন ;—

"ঘৃণা লজ্জা ঈর্ষা দ্বেষ, পাতকের এক শেষ,
চৌর্য্য হত্যা দস্যু বৃত্তি নিয়ত যেখানে,
ভগিনী ভ্রাতার সনে, কথা কয় পাপ মনে,
প্রবঞ্চিত করে জায়া প্রেম প্রতিদানে,
নরের সে অধোগতি, নিরখিয়া নিশাপতি
সত্যই করুণা কি হে হইল না প্রাণে !"

ইহার পরেই কবির মর্ম্মোচ্ছ্বাস জলপ্লাবনের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আপনাদের ধৈর্য্য চ্যুতির ভয়ে তাহা আর উল্লেখ করিব না।

জীবনের অপরাহ্নে কবি গোবিন্দদাস সুষুপ্ত বাঙ্গালী জাতিকে পৃথিবীর অধম জাতি বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উপদেশ—সহস্র তাড়নায়—লাঞ্ছনা, অপমান ও পর পদাঘাতে যে জাতির চৈতন্য হয় না, তাহাদিগকে সামান্য পিপীলিকার অধম মনে করিয়াছিলেন। ১৩১৭ সনে তিনি "পিপ্ড়া" নামে যে কবিতা লিখেন তাহার একস্থানে আছে ;—

"ওগো পিপ্ড়ার সারি—
তোমরা উদ্যমে বড়, অবিশ্রান্ত কর্ম্ম কর,
বিরত বিলাস ভোগে ঋষি ব্রহ্মচারী ;
তোমরা সঞ্চয়ে বড়, পৃথিবী ভ্রমণ কর,
জগতের ধন ধান্য আহরণকারী ;
তোমরা যে এত বড়, নীরবেতে কর্ম্ম কর
কর না বক্তৃতা—সভা হাটে ঢোল মারি ;
তোমরা নহ গো হীন, নরাধম পরাধীন,
গোলাম লস্কর নহ সেবক ভাণ্ডারী ;
নিজে কর নিজ কাজ, নিজ নিজ মহারাজ
নিজেই নিজের প্রজা, আইন আপনারি !"

মৃত্যুর অতি অল্প সময় পূর্ব্বে, নিতান্ত নিরাশায় মগ্ন হইয়া কবি গোবিন্দচন্দ্র "শমী গাছে" নামক কবিতায় স্বীয় অন্তর্গূঢ় বেদনার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন ;—

"ও কবিতা লিখ্‌ব না আর
আমার, কলম থুয়েছি শমী গাছে ;

আমার এখন ছদ্মবেশ,
ছদ্ম সুখ দুঃখ ক্লেশ,
ছদ্ম আমার যোগ তপস্যা
ছদ্ম সাধন রহিয়াছে।
জগতের জঘন্য জীব,
হয়েছি নপুংসক ক্লীব,
মানুষের আর অধঃপতন
ইহার চেয়ে আরকি আছে ?
মেথর মুচি সেলাই—বুরুষ
আর কি আছে অধম পুরুষ।
বীরের জায়া, আজ সে আয়া
দাস্য কষ্টে জীবন বাঁচে
আমার, কলম ধরেছি শর্মী পাছে।"

গোবিন্দ দাসের দৃষ্টি শুধু পল্লী জীবনের প্রতিই নিবদ্ধ থাকিত না, পরন্তু তিনি জগতের উত্থান পতনের দিকেও লক্ষ্য রাখিতেন। যখন মহাচীনে গণতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি আত্মহারা হইয়া লিখিয়াছিলেন ;

"এই যে আছি মৃত্যু শয্যায়, নাইক শক্তি অস্থি মজ্জায়,
কর্ণে শুনি তবু চীনের জয়ধ্বনি বজ্র ভৈরব,
কি আহ্লাদে কি আনন্দে, হৃদয় নাচে বিরাট ছন্দে,
নবোদ্যমে নবোৎসাহে নবজীবন হয় অনুভব ?

•   *   •   *   •

রাম লক্ষ্মণের লঙ্কা জয়ে, যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয়ে,
অশোকের সে দিগ্বিজয়ে, এ ভাব মনে হয় নি উদ্ভব ,
জাগে নাই আর এমন হর্ষ, আজকে যেমন ভারতবর্ষ,
বর্ণে নাই আর কোন কবি এমন ছবি দেবদুর্লভ।
তিন দিনে চীন হ'ল স্বাধীন, জগৎ ভরা জয় জয় রব !"

কবি গোবিন্দদাসের দেশাত্মবোধ যে কত উচ্চস্তরের ছিল তাহা ভাবিবার বিষয়। এ মনীষা প্রতীচ্যে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার অনাদর হইত না ; কিন্তু এ দেশে তাহা আশা করা আকাশ কুসুমের মত অসম্ভব।

কেহ কেহ বলেন, গোবিন্দদাসের কবিতায়—"আর্ট" নাই ; আবার কাহারও কাহারও মতে তাঁহার কবিতায় সার্ব্বজনীনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় অভিযোগটী আমরা স্বীকার করিতে পারিনা।

'আর্ট' বিদেশী জিনিষ—বাঙ্গালীর নিজস্ব নহে। দাস-কবি ইংরাজি জানিতেন না বলিয়া তাঁহার রচনায় 'আর্ট' নামক দুর্ব্বোধ্য পদার্থটা না থাকাই স্বাভাবিক। তাঁহার কবিতা বাঙ্গলার বৈভব পরিপূর্ণ। তাঁহাতে অনুকরণের ছায়া নাই—কৃত্রিমতা নাই। তাঁহার কবিতা এক কাণে প্রবিষ্ট হইয়া অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায় না।

গোবিন্দ দাসের রচনা, প্রাণকে স্পর্শ না করিয়া মিলাইয়া যায় না—তাহা পাঠকের মনের অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে ক্ষমবান্। তাঁহার কবিতা বুঝিতে হইলে পাঁচ জনকে লইয়া বৈঠক বসাইতে হয় না।

তাঁহার সুমার্জ্জিত ভাষা, মধুর ভাব এবং কবিত্বের গাঢ়তা পাঠকের মনকে একেবারে সম্মোহিত করিয়া দেয়। তিনি যে একজন প্রতিভাবান্ কবি ছিলেন, একথা অস্বীকার করিবার কোন পন্থা নাই।

যাহারা কবি গোবিন্দদাসের পরিণত বয়সের রচনা পাঠ করেন নাই, কিম্বা তাঁহার অপ্রকাশিত কবিতাবলী দেখিবার সুযোগ লাভ করেন নাই, তাঁহারাই দাস কবির কবিতায় সার্ব্বজনীনতার অভাব আছে বলিয়া বোধ হয় অনুযোগ করিয়া থাকেন।

পত্নী বিয়োগ ব্যথা স্মরণে কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র বিপত্নীক হৃদয়ের চিত্রপট দেখিতে পাওয়া যায়। কন্যাশোকে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা মানবজাতির অপত্যনাশ জনিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রতিধ্বনি। ভাওয়ালের সর্ব্বনাশ প্রবন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের দারুণ অত্যাচারের করুণ কাহিনী।

গোবিন্দ দাসের কবিতা পাঠে মানুষের উপকার হয়—জীবন সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত মানবের দগ্ধ হৃদয় শীতল হয়। তাঁহার রচনার কোথায়ও হেঁয়ালী নাই—তাহা নিতান্ত সুস্পষ্ট এবং গিরিনদীর মত সাবলীল। তাঁহার কল্পনায় ও ভাব ব্যঞ্জনায় দৈন্য নাই। তাঁহার ভাষা ও ভাব সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব।

বঙ্গ সাহিত্যে কবি গোবিন্দ দাসের ন্যায় কয়জন কবি, পতি পত্নীর প্রেম, সন্তান বাৎসল্য—ভ্রাতৃস্নেহ,—পল্লী জীবনের আত্মকথা—মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের কাহিনী মুক্ত কণ্ঠে বর্ণনা করিয়াছেন? আমরা আবারও বলি যে গোবিন্দচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী কবি ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না।

বঙ্গ সাহিত্যে সাতজন গোবিন্দদাসের অভ্যুদয় হইয়াছিল; তন্মধ্যে, পদাবলী রচয়িতা গোবিন্দদাস প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখ যোগ্য, আর আধুনিক সাহিত্যে এই গোবিন্দদাস অমর হইয়া রহিলেন। অসাধারণ কবিত্ব শক্তির বলে তিনি সাহিত্যের সুবর্ণ মন্দিরে, নিজের যোগ্য সিংহাসন অধিকার করিয়া গিয়াছেন।

মনীষি এমার্সন লিখিয়াছেন,—

"If a man can write a better book preach a better mouse-trap than hie neighbour, though he build his house in the woods, the world will make a beaten path to his door.

কালের পক্ষপাত হীন সুবিচারে এমন দিন আসিবে, যেদিন, আমামাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ কবি গোবিন্দদাস, বাঙ্গালীর কি ছিলেন, বুঝিতে পারিবে।

শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ইন্দ্রপালের দ্বিতীয় তাম্র শাসন।

(গুয়াকুচি লিপি)

এই শাসনখানি ১৯২৫ অব্দের এপ্রিল মাসে জেলা কামরূপের অন্তঃপাতী নলবাড়ী পুলিস ষ্টেশন হইতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী গুয়াকুচি নামক গ্রামে একজন মোসলমান কৃষক আবিষ্কার করে। মোসলমানটি উহার বহু পুরুষের অধিকৃত পুরাতন ভিটা ছাড়িয়া নূতন জায়গায় গৃহাদি সরাইয়া যখন সাবেক ভিটা হইতে মাটি খুঁড়িতেছিল তখন দৈবাৎ ইহা প্রাপ্ত হয়। প্রাপ্তির কিছু কাল পরেই (১৯২৫ আগষ্ট মাসে) এই শাসনখানি আসাম প্রত্নতাত্ত্বিক স্বর্গত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের হস্তগত হয়; এবং তিনিই ইহার কথা সর্ব্বপ্রথম সাধারণের নিকট প্রকাশিত করেন। ••

ইন্দ্রপালের এই দ্বিতীয় শাসন প্রথম শাসনের ১৩ বৎসর পরে, ইন্দ্রপালের রাজত্বের একবিংশ বৎসরে, প্রদত্ত হয়। লেখা প্রথম শাসনের অপেক্ষা স্পষ্টতর। কেবল শেষ ফলকখানির লিপির কিয়দংশ বহুকাল ভূগর্ভাবস্থান বশতঃ ক্ষয়িত হইয়া অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে। তবে ঐ অংশ ভূমির সীমা বিষয়ক হওয়াতে ক্ষতির কারণ বিশেষ কিছুই হয় নাই।

এই শাসনের আকারাদি যে পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনের অবিকল অনুরূপই হইবে ইহা বলা বাহুল্য। অপিচ রত্নপালের দ্বিতীয় শাসনের ন্যায় ইহারও পূর্ব্বাংশ—যাহাতে শাসন প্রদাতার বংশ পরিচয় ও গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে—ইন্দ্রপালের প্রথম শাসনেরই অবিকল প্রতিলিপি। দ্বিতীয় শাসনখানির দ্বারা প্রথম শাসনের পাঠ অনেকাংশ সংশোধিত হইতে পারিয়াছে। আবার দ্বিতীয় শাসনের দুই এক স্থলে শাসনখানি ক্ষয়িত বা ভগ্ন হওয়াতে যে সব শব্দ বা অক্ষর পাড়য়া গিয়াছে অথবা অপাঠ্য হইয়াছে প্রথম শাসনের দ্বারা সেইগুলির অনেকটা পূরণ হইতে পারিয়াছে।

রত্নপালের দ্বিতীয় শাসনের আলোচনার সময়েই বলা হইয়াছে যে একই রাজার ভিন্ন ভিন্ন শাসনে রাজবংশের বা শাসনদাতা নৃপতির বর্ণনা একই হইবে, ইহাই বোধ হয় তৎকালীন রীতি ছিল। * সামান্য বিষয়েও ইতর বিশেষ হইত না। তাই অশোকের সমস্ত শাসনের প্রারম্ভেই 'দেবানাং প্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী' রহিয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক; পরন্তু কামরূপ রাজগণের প্রশস্তি লেখার এইটিই লক্ষ্যের বিষয় সেই বরাহ নরক ভগদত্ত এবং অনেকশঃ বজ্রদত্ত ইঁহাদের বর্ণনায় এমন কি নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষের বর্ণনায় (যথা ইন্দ্রপালের শাসনে রত্নপালের কথায়) পূর্ব্বতন

* অনেক সময় হয়ত একই কবি সেই রাজার সবগুলি শাসনের রচনা করিতেন। তৎস্থলে ঈদৃশ সমতা খুবই স্বাভাবিক। মহাকবি কালিদাসও তদীয় রঘুবংশ ও কুমার সম্ভবে কতকগুলি শ্লোক উভয় কাব্যে অবিকল প্রয়োগ করিয়াছেন। রঘুবংশের সপ্তমসর্গে অজের বরবেশে বিদর্ভরাজপুরী প্রবেশের এবং কুমার সম্ভবের সপ্তমসর্গে মহাদেবের বরবেশে হিমালয় রাজপুরীতে প্রবেশের বর্ণনায় তাহা দেখা যাইবে।

নৃপতির শাসনের কোনও শ্লোকের পুনঃ প্রয়োগ হয় নাই—যেমন গৌড় লেখমালায় পাল রাজগণেরই কতকগুলি তাম্রশাসনে * দেখা যায়।

এই শাসন দ্বারা ব্রহ্মপুত্রের উত্তর কূলে মন্দিবিষয়ান্তঃপাতী পণ্ডরী ভূমিভাগে ২০০০ (দ্রোণ) ধান্যোৎপত্তি হইতে পারে—এমন ভূমি প্রদান করা হইয়াছে। এই পণ্ডরী ভূভাগের পরিচিহ্ন অদ্যাপি কামরূপে বিদ্যমান আছে। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের রঙ্গিয়া ষ্টেশনটী যে মৌজার (পরগণার) অন্তর্গত তাহার নাম পণ্ডরী। প্রদত্ত ভূমির সীমা বর্ণনে কামেশ্বর মহাদেবের নাম আছে। ‡ শাসন প্রাপক ব্রাহ্মণের নিবাস ছিল সাবথিস্থিত বৈনামক গ্রামে। ইঁহার নাম দেবদেব, পিতার নাম বাসুদেব, মাতার নাম অনুরাধা এবং পিতামহের নাম সোমদেব। ইঁহারা কাণ্বশাখার যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

এই শাসন খানিতে এ টি কৌতুকাবহ বিষয় রহিয়াছে। যাহা অপর কোনও তাম্রশাসনে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। প্রদত্ত ভূমির সীমা বর্ণনার পরে তাম্রশাসনের লিপি শেষ হইবার সময়ে দেখা গেল ফলকখানিতে মাত্র ৫ পংক্তি লেখা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম ফলক ১৮ পংক্তি দ্বিতীয় ফলকের উভয় পৃষ্ঠে ১৭ পংক্তি করিয়া লিখিত হইয়াছে। তাই বোধ হয় তৃতীয় অর্থাৎ শেষ ফলক খানিতে এতটা খালি জায়গা পড়িয়া থাকা। অশোভন মনে করিয়া শাসন লেখক জুড়িয়া দিলেন ‘শ্রীমৎপরমেশ্বর পাদানাং’ (অর্থাৎ শাসন প্রদাতা ইন্দ্রপাল নৃপতির) দ্বাত্রিংশন্নামানি অমূনি”; অর্থাৎ রাজার বত্রিশটি বিশেষণ (প্রাতিপদিকাকারে) বসাইয়া দিলেন।

নারায়ণ মহাদেব প্রভৃতি দেবতাগণের শত নাম সহস্র নাম আছে; পরমেশ্বর শব্দদ্বারা ভূপতিকে ঐ সকল দেবতার সমশ্রেণীতে স্থাপন করিয়া তাঁহার নামাবলীর রচনায় শাসন লেখক বিলক্ষণ চাতুর্য্য ও রাজভক্তি দেখাইয়াছেন।

ইহাতেও ফলকের পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ ভরিয়া যায় নাই। কিছুটা জায়গা খালি রহিয়াছে দেখিয়া ইহাতে তৎকালীন চিত্রাঙ্কন বিদ্যারও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

---

* গৌড় লেখমালায় প্রকাশিত নরনারায়ণ পাল, প্রথম মহীপাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মদন পালের তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য।

‡ বনমাল দেবের তাম্রশাসনে রাজধানী বর্ণনা উপলক্ষে লৌহিত্যের যে বর্ণনা আছে তাহাতে আছে ‘শ্রীকামেশ্বর মহাগৌরীভট্টারিক’ ত্যামধিষ্ঠিতশিরসঃ কামকূটগিরেঃ সততনিতম্বকালনাদধিকতর পবিত্রপয়ঃ সম্পূর্ণস্রোতসা শ্রীলৌহিত্য ভট্টারকেণ।’ ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে ঐ কামেশ্বরমহাগৌরীর স্থান ব্রহ্মপুত্রের তীরে ছিল। একটি (অনতি উচ্চ) পর্ব্বতের শিরোভাগে এবং তাহা সম্ভবতঃ রাজধানী হারূপেশ্বরের মধ্যে না হইলেও উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল। হারূপেশ্বর বর্ত্তমান তেজপুরের প্রাচীন নামান্তর অথবা সন্নিকটস্থ কোন স্থান হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছে, তেজপুর হইতে বর্ত্তমান পণ্ডরী মৌজা অনেক দূর, অথচ পণ্ডরীর নিকটেই কামেশ্বর দেবালয় বর্ত্তমান। লক্ষ্যের বিষয় বনমালের শাসনে “কামেশ্বর মহাগৌরীভট্টারিক ত্যাম” আছে। ইন্দ্রপালের এই শাসনে আছে “মহাগৌরী কামেশ্বর” নামোল্লেখে ঈদৃশ পৌর্ব্বাপর্য্য ব্যত্যয়ে বোধ হয় ইহারা পরস্পর ভিন্ন দেবতা, সম্ভবতঃ তৎপীঠস্থ শিবলিঙ্গের এই নাম ছিল যে পীঠের উপর লিঙ্গ স্থাপিত হয় তাহার সাধারণ নাম যোনি পীঠ বা গৌরী পীঠ। এ স্থলে আরো বক্তব্য যে “কামেশ্বর” নামক অপর এক মহাদেব কামাখ্যাধামেও আছেন।

নারায়ণের শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম এবং বোধ হয় গদার উপর সন্নিবিষ্ট একটি শুকাকার পক্ষ (সম্ভবতঃ গরুড়)—ঐ গুলির ক্ষুদ্রাকার অথচ অতিসুন্দর ছবি উৎকীর্ণ হইয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে কোচ আহোমগণের অধিকার কালে কামরূপে যে সব পুঁথি লিখিত হইয়াছে, সেইগুলি অনেকশঃ নানাবিধ চিত্রদ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে। এই শাসনের উৎকীর্ণ চিত্রগুলি তাহারই পূর্ব্বাভাস বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে এই সকল পুঁথির চিত্র গুলি গ্রন্থে বর্ণিত কোনও বিষয় সম্পৃক্ত। এই শাসনের চিত্র গুলির তাদৃশ নহে। (১) ছবির পাশে একের নীচে আর, এ ভাবে 'শনি' 'বল' 'অনি' এই তিনটি পদ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ এই গুলি ফলককার, তক্ষকার এবং চিত্রকর এই তিন জনের নাম অথবা নামের প্রথমাংশ।

(মূল)

(প্রথম ফলক)

১। স্বস্তি। পট্টাঙ্গং পরশুর্ব্বৃষঃ শশিকলেত্যাদি (১) স্বদীয়ং ময়া

সর্ব্বস্বং জিতমদ্য নাম (২) কিতব প্রাপ্য (স্থিতং তে পুনঃ) (৩)।

২। প্রেম্ণা কেবলমস্ব মে জলবহা গঙ্গেতি গৌরীগিরা

শম্ভো দ্যূতকলাজিতস্য জয়তি ব্রীড়াবিনম্রং শিরঃ ॥১ (৪)

৩। জয়তি পশুপতিঃ প্রজাধিনাথো

মহিতবপুর্ম্মহিমা মহাবরাহঃ।

ইয়মপি চ ভগদত্তবংশ (৫) মাত্রা

ধর

৪। শিরনস্য (৬) নরাধিপপ্রতিষ্ঠা ॥২

যদ্বারি রামপরশো র্নৃপকণ্ঠকাণ্ড-

লাবণ্য (ধৌতঘন) লোহিতপঙ্কমার্গাঃ।

৫। লৌহিত্য ইত্যধিপতিঃ সরিতাং স (৭) এষ

ব্রহ্মাণ্ডভূর্দ্দিতু বঃ কলিকল্মষাণি ।৩

বল্গৎখুরক্ষুভিত (৮) ভীম

৬। ভুজঙ্গসদ্মা

(১) এইরূপ নিরর্থক চিত্রের এক প্রাচীন উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। গুপ্তাব্দ ২৬৮ (খৃঃ ৫৮৮—৮৯) সনে খোদিত 'মহানামের শিলালিপি'তে ধেনু বৎসের চিত্র আছে "Below the inscription, towards the proper right-side of the stone, there are engraved in out-line a Cow and a Calf standing towards, and nibbling at, a small tree or a bush (P. 274, Corp. Insc. Ind vol III) কিন্তু ইহা তাম্রশাসন নহে শিলালিপি—ইহাতে ছবি আঁকিবার যথেষ্ট স্থান পাওয়া যায়।

(২) মূলে আছে "ভাদী" (প্রথম শাসনে ও এই ভুলটি রহিয়াছে, আশ্চর্য্য !) (২) মূলে আছে নম। (৩) ফলকের এই অংশ ক্ষরিত হইয়া যাওয়ায় প্রথম শাসন দেখিয়া অক্ষরগুলি জুড়িয়া দেওয়া গেল। এইরূপ পরবর্ত্তী সাধারণ অংশের অন্যান্য স্থানেও করা হইয়াছে। (৪) প্রথম হইতে উনবিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত উভয় শাসনেই সাধারণ হওয়াতে এইগুলির ছন্দ উল্লেখিত হইলনা। (৫) মূলে আছে "বংশঃ" (৬) মূলে আছে "অনন্তর" (৭) মূলে আছে স' (৮) মূলে আছে ক্ষুভিতো

কল্পাবসান দিনভিন্নসমুদ্রমুদ্রাং।
পাতালপঙ্কপটলোদরসন্নিলীনাং
ক্রোড়াকৃতি
৭। র্ব্বসুমতী (?) হরিরুজ্জহার (১) ॥৪
দ্রংষ্ট্রাঙ্কুরোদ্ধৃতধরাপরিরম্ভগর্ভ
সম্ভোগ সম্ভৃতরসালসমান (স) স্য।
তস্যা
৮। স্মজো নর (প) তি র্নরকাভিধানঃ
শ্রীমানভূদ্ভুবনবন্দিতপাদযুগ্মঃ ॥৫
রত্ন প্রভারুচির—
মাস্পদমেব লক্ষ্যা (:) (২)
৯। পুণ্যোপকণ্ঠবিলসদ্বনমালভারি।
প্রাগ জ্যোতিষপুর মপা
১০। রযশাঃ স উচ্চৈ
র্বক্ষঃ স্থলস্পিতুরিবাপরমধ্যবাস ॥৬
তস্যাপি সূনুর ভবদ্ভগদ
১১। ত্তনামা
বিশ্রামভূমিরখিলস্য পিতুর্গুণস্য
সত্ত্বোদ্ধতঃ সততমূনবলে বলীয়া
১২। ন্যঃ পক্ষপাতমকরো (ৎক্ষ) তবৈরিপক্ষঃ ॥৭
ভৌমান্বয়োন্নতিপদপ্রথিতপ্রতিষ্ঠঃ
পৃ
১৩। থ্বী ভুজাং (৩) বিজয়িনাঙ্কুরি বজ্রদত্তঃ।
দোর্ব্বজ্রবীর্য্যপরিতোষিতবজ্রপাণি
রাসী দমুষ্য মুষিতারিযশা
স্তনূজঃ ॥৮
১৪। তস্মিন্নেব নৃপান্বয়ে নরপতিঃ শ্রীব্রহ্মপালোভব
ত্তস্যাত্মা ভুবি রত্নপাল ইতি চ খ্যাতঃক্ষ
তারির্ব্বশী।

---

(১) মূলে আছে "জহারঃ"
(২) মূলে আছে "লক্ষ্মা"
(৩) মূলে আছে 'জাথি'

১৫। অস্যানঘগুণাকরস্য মহিমা রাজ্ঞশ্চ কিং বর্ণ্যতে (১)
যঃ শ্লাঘ্যোন্নতিদিক্ষ্বতে সুচরিতৈঃ (রা)

১৬। মস্য কৃষস্য বা'গ৯

সম্বন্ধা (২ বসুধা সুধাধবলিতৈঃ শম্ভু প্রতিষ্ঠাস্পদৈ
যস্য (৩) শ্রোত্রিয়মন্দিরাণি বিভবৈ-র্না

১৭। নাপ্র) কারৈরপি।
যূপৈ যজ্ঞগৃহাঙ্গণানি হবির্ধূমৈ র্নভোমণ্ডলং
যাত্রারেণুভিরন বায়ু (বিক্ষু-

১৮। শুভৈ শ্চ স) র্ব্বাদিশঃ ॥১০
আসীদুদারকীর্ত্তি
দাতা ভোক্তা কলা কুশলঃ।
তস্যপুত্র (ন্দ্রপালঃ)

দ্বিতীয় ফলক—১ম পৃষ্ঠা

১৯। শূরঃ শূরশ্চ সুকবিশ্চ ॥১১
কুসুমরিকৌতুকসমক
ম্মৃগয়া রসিকেন যেন সমরাপি।
(ক্ষণ)

২০। বিরচিতশরপঞ্জরবৈরিপুরাঙ্গশার্দ্দূলৈঃ (৪) ॥১২
জামদগ্ন্যভুজবিক্রমার্জ্জিত
প্রাজ্যরাজ্যনৃপব
ংশ (৫) সম্ভবা।

২১। দুর্ল্লভেতি স তু লোকদুর্ল্লভা (:)
প্রাপ্য সম্যগভবৎ কলত্রবান্ ॥১৩
সচীব শক্রস্য শিবেব শ

২২। স্যো

---

(১) মূলে আছে 'কিম'
(২) মূলে আছে "সবাধা" (প্রথম শাসনে 'সবধা' আছে)
(৩) মূলে 'বস্য' আছে (রেফটা নাই)
(৪) মূলে আছে 'সার্দ্দূলৈঃ'
(৫) মূলে আছে 'বস'

রতিঃ স্মরস্যেব হরেরিব শ্রীঃ
সা রোহিণীব ক্ষণদাকরস্য
তস্যানুরূপপ্রণয়া বভূব ॥১৪

২৩। দেবঃ প্রাচীপ্রদীপঃ প্রকট বসুমতীমণ্ডনঃ খণ্ডিতারিঃ
জাতস্তাভ্যাং জিতাত্মা নয়বিনয়বতা-

২৪। মগ্রণীরিন্দ্রপালঃ ॥
যস্মিন্ সিংহাসনস্থে স্বয়মব নিভৃতাং বন্ধসেবাঞ্জলীনা
মাবর্জ্জন্মৌলির

২৫। ত্নৈঃ ফলিতমিব সভাকুট্টিমং কীর্য্যমাণৈঃ ॥১৫
সুবিস্তৃতানাং (১) পদবাক্য তর্ক-
তন্ত্রপ্রবাহাতিতরস্বি

২৬। নীনাং।
যঃ সর্ব্ববিদ্যা সরিতা মগাধ
মন্তর্নিমগ্নশ্চ গতশ্চ পারং ॥১৬
স্বর্গং গতে পিতরি যস্য যশঃ
শরীরে

২৭। পৌত্রস্য পূতম নসা হরিবিক্রমেণ।
রাজ্ঞা বয়ঃপরিণতেন গুণানুরূপ

২৮। মিত্যর্প্পিতা স্বয়মিয়ন্নিজরাজলক্ষ্মীঃ ॥১৭
যস্মিন্নৃপে বিনয়বিক্রমভাঞ্জি জাতে
স-

২৯। ম্যগ্বিভক্তচতুরাশ্রমবর্ণধর্ম্মা।
আনন্দিনী সকলকামদুঘা প্রজানাং
পৃথ্বী

৩০। পৃথৌ পুনরিব প্রথিতোদয়াসীৎ ॥১৮
করিতুরগরত্ন পূর্ণা রাজ্য স্তস্যানুরূপগুণ বস

৩১। তিঃ।
নৃপতিকুলদুর্জ্জয়াসী
ম (২) গরী শ্রীদুর্জ্জয়া নাম ॥১৯

---

(১) মূলে আছে "সরিস্তৃতানাং"
(২) মূলে আছে "য়াসীৎম"।

প্রাগ্জ্যোতিষাধিপত্যসংখ্য তাপ্র –

৩২। ত্রিহতদণ্ডক্ষপিতাশেষ রিপুপক্ষ শ্রীবারাহপরমেশ্বর
পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রী

৩৩। রত্নপালবর্ম্মদেবপাদানুধ্যাতঃপরমেশ্বরপরমভট্টারক
মহারাজাধিরাজ শ্রীমদিন্দ্র—

৩৪। পালবর্ম্মদেবঃ কুশলী ॥ • ॥ উত্তর কূলে মন্দি বিষয়ান্তঃ
পাতি পণ্ডরা ভূমি (ভাগেন—

৩৫। পকষ্ট) (১) ধান্যদ্বিসহস্রোৎপাদকভূমৌ ॥•
যথাস্থিতং সমুপাস্থিত নিয়ম করণ ব্যাবস্থা

৩৬। রিকপ্রমুখজানপদান্ রাজরাজ্ঞী রাণকাধিকৃতানন্যানপি
রাজন্যক। রাজপুত্র। রাজব

৩৭। ল্লভ প্রভৃতীন্ যথাকালভাবিনোপি সর্ব্বান্ সম্মাননা
পূর্ব্বকং সমাদিশতি বিদি (তমস্ত)

"দ্বিতীয়ফলক ২য় পৃষ্ঠা"

৩৮। ভবতাং ভূমিরিয়ং বাস্তুকেদার স্থলজলগোপ্রাচরাবস্করাদ্যু-
পেতা যথাসংস্থা স্বসা-

৩৯। মোদ্দেশ পর্য্যন্তা হস্তিবন্ধ। নৌকাবন্ধ। চৌরোদ্ধরণ।
দণ্ডপাশোপরিকর। নানানি—

৪০। মিত্তোৎখেটনহস্ত্যশ্বোষ্ট্র। গোমহিষাজাবিক প্রচার প্রভৃতী নাংবিনি (২)
বারিত সর্ব্ব

৪১। পীড়া শাসনীকৃত্য—
সাবথামস্থি বৈনামা গ্রামো ধাম দ্বিজন্মনাং।
ধর্ম্মস্য

৪২। ধর্ম্মভীতস্য ব্রহ্মণাস্তুতিদঃ কলৌ ॥ ২০৩ (৩)
কাশ্যপস্তত্র পুণ্যাত্মা সোমদেবোভবদ্দ্বিজঃ। (৪)

৪৩। কাণ্ব (৫) শাখো যজুর্ব্বেদী দেবঃ সাক্ষাদিবাগ্রজঃ ॥২১
বসুদেব ইতি শ্রীমান্ বসুদেব ইবা

গ্রজঃ

(১) এখানে কয়েকটি অক্ষর পাঠ করা দুরূহ—অনুমানতঃ এইটুকু বসাইয়া দেওয়া হইল। (২) মূলে আছে নাম্বিনি। (৩) অনুষ্টুভ্ (পথ্যাবক্ত্র) বৃত্ত। ২১, ২২, ২৫ সংখ্যক শ্লোকেও এই বৃত্ত (৪) মূলে আছে "ভবদ্বিজঃ" (৫) মূলে আছে 'কম্ব'।

৪৪। তস্য চক্তে মুহন্নন্দসুপ্রীতপুরুষোত্তমঃ ॥২২
অস্য মুনেরিব বশিনঃ (১) পত্নী শীলৈ ররুন্ধতীবাসীৎ।
৪৫। অনুরধেতি (২) কুলীনা গঙ্গেবাপাস্তকলিকলুষা ॥ ২৩ (৩)
দে।
৪৬। বক্যামিব তস্যাং তেনাজনি দেবদেব ইতি সুনুঃ।
৪৭। হরিরির গোপ হিতৈষী
যশোদয়া স্বীকৃতঃ শ্রীমান্ ॥ ২৪
দ্বিজায়াস্মৈ মহী ধান্য সহস্রদ্বয়
৪৮। লম্ভিতা।
ময়া রাজ্যস্য দত্তেয় মেকবিংশ তিবৎসরে ॥২৫
তস্যাঃ
৪৯। সীমা পূর্ব্বেণ মহাগৌরী। কামেশ্বরয়োঃসংক শাসন
মর্ক্কটীকোক (৪)। রাজপুত্রবাসক।
৫০। পণ্ডরীভূসিম্নি বাস্থালিহ কণ্টফলবৃক্ষ। ক্ষেত্রালী।
পশ্চিমগবক্রেণ তড়ু (ঃ) বীরস
৫১। ংক মুক্তিকুম্বরা পণ্ডরীভূম্যোস্ সীম্নি ক্ষেত্রালিঃ। দক্ষিণ
গবক্রেণ তড়ুসীম্নি ক্ষেত্রালিঃ।
৫২। পূর্ব্বদক্ষিণেন তড়ু (ঃ)। মহাগৌরীকামেশ্বরয়োস্ সংকশাসন
পণ্ডরীভূম্যোঃ সীম্নি ক্ষেত্রালিঃ
৫৩। দক্ষিণেন তড়ুসীম্নি ক্ষেত্রালি। হাহারবিজোলোত্তর কূলে। (৫)
দক্ষিণপশ্চিমেন তড়ুসীম্নি। *
৫৪। ক্ষেত্রালি মস্তকঃ। পশ্চিমেন তড়ু (ঃ) বসুমাধবদেবসংক
শাসনপণ্ডরীভূসীম্নি ক্ষেত্রালি।
৫৫। জিহলী বৃক্ষৌ। পূর্ব্বগ উত্তরগবক্রেণ তড়ুসীম্নি শাকোটক
জোলদক্ষিণ কূল। ক্ষেত্রালী।
৫৬। পশ্চিমোত্তরেণ তড়ুসীম্নি ক্ষেত্রালিমস্তকঃ পূর্ব্বগবক্রেণ
তড়ুসীম্নি তজ্জোল দক্ষিণ কূ

---

(১) মূলে আছে "বসিনঃ"। (পরন্ত "বসিষ্ঠ" এইরূপও হয়—তাহাতে নাম নিরুক্তিতে 'বসিন্+ইষ্ঠ' এইরূপ দেখা যায়।)

(২) মূলে আছে "অনুধারেতি"

(৩) আর্য্যা জাতি। পরবর্ত্তী শ্লোকেও এই জাতি।

(৪) ইহা এবং এতৎপরবর্ত্তী প্রাকৃত নাম গুলির পাঠ বিশুদ্ধ হইয়াছে, একথা নিঃসন্দেহ বলা যায় না।

(৫) মূলে আছে কূলো।

তৃতীয় ফলক

৫৭। লং। উত্তর গ। পশ্চিম গ উত্তর গ ২ক্রেণ ত দু সীমি
" " স্থলী " " (১)

৫৮। * * দক্ষিণ কূল কণ্টকী বৃক্ষঃ। উত্তরেণ ত দু

৫৯। স্রোতসীস্রোতদক্ষিণকূলং। উত্তরগ। পূর্ব্বগবক্রেণ ত দু (:)
ত দু সীমি দক্ষিণ পূর্ব্বক—

৬০। ল দক্ষিণ কূলে। উত্তর পূর্ব্বেণ ত দুঃ। মহাগৌরী। কামেশ্বরয়ো
র্ভূয়ঃ সংকশাসনপণ্ড—

৬১। রী ভূয়োস্ সীম্নি বাস্থালিশেচি॥×॥
শ্রীমৎ পরমেশ্বর পাদানাং দ্বাত্রিং (২)

৬২। শন্নামান্যম্নি। কীর্ত্তি কমলিনী মার্ত্তণ্ড।
লক্ষ্মীভারোদ্বহনাসন। সকললোকশঙ্ক-

৬৩। র। করুণার্জীমূতবাহন। সংগ্রামস্তম্ভ। অবংশ (৩) হভীম।
অপ্রতিহতশক্তিকার্ত্তি—

৬৪। কেয়। বিপক্ষবলভিৎ। নরসিংহবিক্রম।
কলিকাল জলধি নিমজ্জ-

৬৫। দ্বসুন্ধরাদিবরাহ। সাহসৈকসহায়।
দক্ষর্দ্ধৈকপার্থ। অনন্তক্ষত্রব

৬৬। ংশ (৩) ভার্গব। উদ্ধতভূভৃদশনিপাত।
অন্তঃপুরভুজঙ্গ। সরস্বতী

৬৭। নিজনিবাস। সুহৃন্মানসরাজহংস।
কামিনীমনোমোহনৈকমন্মথ।

৬৮। অনবদ্যবিদ্যাধর। সমরসাগরমৃগাঙ্ক।
প্রজ্ঞাবধূবল্লভ। কলাবিলাসিনীসুভ-

৬৯। গ। অর্থিজনমনোরথকল্পদ্রুম।
মিত্রোদয়প্রভাতসময়। ধর্ম্মবি রাধিবর্ম্মসী

৭০। ম। সদ্গুণকর্ণাবতংস। সচ্চরিতচন্দনমলয়গিরি।
মেদিনীতিলক। প্রচণ্ডন-

(১) ফলকের এই অংশ ক্ষয়িত হইয়া যাওয়াতে অনেকগুলি অক্ষর একেবারে অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে।

(২) মূলে আছে 'ত্বাত্রং'

(৩) মূলে 'বংস' আছে।

৭১। যগণ্ড। ধরণীত্রিপুণ্ড (১)। তুরঙ্গ (ব) লবং (২)।

হরগিরিজাচরণপঙ্কজরজোরঞ্জিতো

৭২। ত্তমাঙ্গ।

৭৩। (ছবি)

শনি

বল

অমি গদার উপর পক্ষী। পদ্ম। শঙ্খ। চক্র

(গরুড়)

পুষ্করিণী দক্ষিণ ত ডুঃ (৩)

(শিল) (হস্তিমূর্ত্তি)

স্বস্তিপ্রাগ জ্যোতিষাধিপতি

মহারাজাধিরাজ শ্রীমদিন্দ্র পালবর্ম্মদেবঃ।

——০——

(ইন্দ্রপালের ২য় তাম্রশাসন

অনুবাদ

(১৯শ শ্লোক পর্য্যন্ত ১ম শাসনের অবিকল অনুরূপ)

অতঃপর "কুশলী" পর্য্যন্তও তথা।)*

ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকূলে মন্দি বিষয়ের অন্তর্গত পণ্ডরী ভূমি ভাগে ২০০০ ধান্যোৎপত্তিমতী ভূমিতে যথাযথ * * * শাসনের বিষয়ী ভূত করিয়া......॥ (১ম শাসনের অনুরূপ) *

সাবথি (বিষয়ে) দ্বিজগণের বাসভূমি বৈনামক একটা গ্রাম আছে। কলিকালেও তাহা ধর্ম্মের, অধর্ম্ম ভীরুর এবং ব্রাহ্মণগণের উন্নতি দায়ক।

সেই গ্রামে কাণ্বশাখ যজুর্ব্বেদী কাশ্যপ গোত্রজ সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সদৃশ পুণ্যাত্মা সোমদেব নামা জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

তাঁহার শ্রীমান্ বসুদেব নামক পুত্র ছিলেন। নন্দসুহৃৎ সুপ্রীতপুরুষোত্তম বসুদেবের ন্যায় ইনিও সুহৃৎগণের আনন্দন ছিলেন এবং পুরুযোত্তম (নারায়ণ) ইঁহার প্রতি প্রীত ছিলেন।

বশিষ্ঠ মুনির পত্নী অরুন্ধতীর ন্যায় চরিত্র সম্পন্না ইঁহার অনুরাধা নামে সদ্‌গুণসম্পন্না পত্নী ছিলেন। তিনি গঙ্গার ন্যায় দূরীকৃতকলিকল্মষা হইয়া ছিলেন।

(১) মূলে আছে "তৃপুণ্ড" (২) মূলে আছে "তুরঙ্গলবত্ত"

(৩) বড়ই অস্পষ্ট। সম্ভবতঃ ৫৭ কি ৫৮ সংখ্যক পংক্তির কোনও অংশ এখানে লিখিত হইয়াছিল। (৫৮ পংক্তির অস্পষ্টাংশের কিছুটা কাটা দেখা যায়—হয় তো তাহাই এখানে আনিয়া লেখা হইয়াছিল)।

* এইগুলির অনুবাদ রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৭ম ভাগ ১৩১৯ ৪র্থ সংখ্যা ১৫৪—১৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দেবকীর গর্ভে যেমন গোপহিতৈষী, যশোদা কর্ত্তৃক স্বীয়পুত্ররূপে পালিত শ্রীহরি জনিত হইয়াছিলেন সেইরূপ ইঁহার (অনুরাধার) গর্ভে পৃথিবীপালহিতকামী যশোঃ দয়া দ্বারা অলংকৃত(১) শ্রীমান দেবদেব নামক পুত্র তদ্দারা (অর্থাৎ বসুদেব কর্ত্তৃক) উৎপাদিত হইয়াছিলেন।

এই ব্রাহ্মণকে দুই সহস্র ধান্যোৎপাদিকা ভূমি মদীয় রাজ্যের একবিংশতি (তমে) বৎসরে প্রদত্ত হইল।

ইহার সীমা পূর্ব্বে মহাগৌরী কামেশ্বরের অধিকৃত শাসন মর্ক ভীকোক রাজপুত্রবাসক ও পণ্ডরী ভূমির সীমাস্থ বাস্তু আলির উপরিস্থিত কাটালগাছ ও ক্ষেত্রালি, পশ্চিমগামী বাঁকে সেই ভূমি বীরের অধিকৃত সুকৃতিকৃশ্বরা ও পণ্ডরী ভূমির সীমার ক্ষেত্রের আলি; দক্ষিণগামী বাঁকে ঐ ভূমিসীমাস্থিত ক্ষেত্রের আলি। পূর্ব্বদক্ষিণে সেই ভূমি, মহাগৌরী কামেশ্বরের অধিকৃত শাসন ও পণ্ডরী ভূমির সীমাস্থিত ক্ষেত্রের আলি। দক্ষিণে সেই ভূমির সীমা স্থিত ক্ষেত্রের আলি এবং হাহারবি জোলের (২) উত্তরকূল। দক্ষিণপশ্চিমে সেই ভূমির সীমাস্থ ক্ষেত্রের আলির মাথা। পশ্চিমে সেই ভূমি বসুমাধক দেবের অধিকৃত শাসন ও পণ্ডরী ভূমির সীমাস্থিত ক্ষেত্রের আলি এবং জিহলীবৃক্ষ, পূর্ব্বগামী ও উত্তরগামী বাঁকে সেই ভূমির সীমায় শেওড়া গাছ ও জোল-দক্ষিণ কূলস্থ ক্ষেত্রের আলি। পশ্চিমোত্তরে সেইভূমির সীমাস্থিত ক্ষেত্রের আলির মাথা, পূর্ব্বগামী বাঁকে সেই ভূমির সীমায় সেই জোলের দক্ষিণ কূল, উত্তরগামী বাঁক দিয়া সেই ভূ সীমায় * * স্থলী * * * (জোল) দক্ষিণ কূল (স্থ) কাটালগাছ। উত্তরে সেই ভূমি * * * স্রোতসা জোলের দক্ষিণকূল, উত্তরগামী ও পূর্ব্বগামী বাঁক দিয়া সেই ভূমি ঐ ভূমির সীমাস্থিত দক্ষিণপূর্ব্বকূল ও দক্ষিণকূল। উত্তরপূর্ব্বে সেই ভূমি পুনরপি মহাগৌরী কামেশ্বরের অধিকৃত শাসন ও পণ্ডরী ভূমির সীমাস্থিত বাস্তু আলি।

(এইস্থলে রাজার যে বত্রিশটি নাম অর্থাৎ উপনাম দেওয়া হইয়াছে তাহার অনুবাদ অনাবশ্যক বোধে লেখা হইল না।)

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

(বিদ্যাবিনোদ তত্ত্বসরস্বতী, এম্, এ)

(১) এখানে 'গোপ' শব্দ শ্লিষ্ট—'যশোদয়া' শব্দও দ্বিবিধার্থবাচক।

(২) জোলা অর্থ ছোঁড়া বাঁকুয়া নদী (এখনও এই নাম প্রচলিত)

স্বভাব চিকিৎসা।

রোগারোগ্যের কোনও একটা সুগম পন্থা অবগত হইলে এবং তদ্দ্বারা উপকার প্রাপ্ত হইলে তাহা সাধারণের ভিতর প্রচারিত করার প্রয়াস করা বাতুলতা নয় এবং ইহাতে সাধারণের অপকার না হইয়া বরং উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে জানিয়াই এই মহদনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছি। সুতরাং সমস্ত তত্ত্ব কিরূপে সংগৃহীত হইল তাহা যথাযথ ভাবে বিবৃত করিতে গেলেই আত্ম নিবেদন না করিয়া উপায় নাই।

প্রবন্ধ লেখকের এখন ৬০ বৎসর বয়স এবং জীবন সন্ধ্যায় দুই বৎসরের অধিক কালের ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, পিত্তশূল বেদনা প্রভৃতিতে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াই ছিল ; কিন্তু জগৎ পাতা জগদীশ্বরের অশেষ করুণার ফলে এই স্বভাব চিকিৎসাতত্ত্ব কথঞ্চিৎ মাত্র অবগত হইয়া স্বভাবের পথে চলায় এখন রোগ মুক্ত হইয়া এবং লেখকের বাটীস্থ বাত রোগী, জ্বরের রোগী, আঙ্গুল হাড়ার রোগী, সাপে কাটা রোগী প্রভৃতি বিনা ঔষধে বিনা ডাক্তারে স্বয়ং আরোগ্য করায় এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হওয়ার জন্য লুই কুনে প্রভৃতি মহাত্মগণের প্রচারিত গ্রন্থ গুলি এবং সাময়িক সংসৃষ্ট পত্রিকা স্বভাবের পথে ও Nature Healer, নামক ইংরাজী মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি আনাইয়া এ পর্য্যন্ত অনেক লোকের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা রকমের রোগ বিনা অস্ত্রে বিনা ঔষধে আরোগ্য করায় বিষয়টীর গুরুত্ব ক্রমেই উপলব্ধি করিয়া এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা যাহাতে হয় এবং রোগ অনুসারে ধারাবাহিক চিকিৎসা প্রণালীর প্রচার না হওয়ায় ঐ সম্পর্কে সমস্ত অসুবিধা গুলি দূর করিবার মানসে এক খানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনার প্রয়াসী হইয়াছে। দেশের কৃত-বিদ্যগণ সহায়তা করিলে সমস্ত গ্রন্থ এবং তদুপযোগী আবশ্যকীয় (aparatus) যন্ত্রপাতী সমস্তই সাধারণের হিতকল্পে আনাইয়া প্রকৃত চিকিৎসা প্রণালী অনেককেই শিখাইয়া দেওয়ার পথ করা যাইতে পারে।

চিকিৎসার মূল সূত্র

বিনা ঔষধে এবং বিনা অস্ত্র প্রয়োগে প্রকৃতির মূল উপাদান দ্বারা যাবতীয় রোগ আরোগ্য হইতে পারে একথা মহামতি ডাক্তার লুই কুনে স্ফীত বক্ষে জার্ম্মাণ দেশীয় লিপজিক নগরে বহু নর নারী সমক্ষে এক সভায় ১৮৮৩ সালে ১০ই অক্টোবর তারিখে প্রচার করেন। সে বক্তৃতার সার মর্ম্ম—"What led me to the discovery of the new Science of Healing" (vide New Science of Healing Page 1 13 part 1)

তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে স্বভাবের পথে থাকিলেই ঔষধ পান ও শস্ত্রোপচার আদি আবশ্যক হয় না। আপনাপনিই ব্যাধির উপশম হইতে পারে যদি আমরা প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট

নিয়মে চলিতে পারি। পাঠক, শ্রোতৃবর্গ এইরূপ দৃঢ়তা ব্যঞ্জক বক্তৃতার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবার কথা এবং বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ডাক্তারী, কবিরাজী ও পেটেন্ট ঔষধের ছড়া ছড়ি হইয়াছে এরূপ স্থলে একথা প্রচার করিতে হইলে বহু লোকের ভাত মারা যায়। বিলাতী ঔষধের সুরম্য হর্ম্ম্য গুলি ধূলিসাৎ হওয়ার আশঙ্কা আসে এবং দেশী কবিরাজ মহোদয়গণের প্রস্তুত বটিকা তৈল, ঘৃত, মোদক, রস প্রভৃতি বিক্রয় বন্ধ হয়। সুতরাং এরূপ বৃহৎ ক্ষতিজনক ব্যাপারে মৎ সদৃশ অভাজনের হস্তক্ষেপ করা পাগলামীর কথা বটে, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে সত্য প্রচারিত হইলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও ধন রক্ষার উপায় হয়। যাঁহারা ঔষধ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন তাঁহারা মূল ধন হইলে অন্য ব্যবসাও চালাইতে সক্ষম হইবেন সুতরাং এমন সুসংবাদ দেশে রাষ্ট্র হওয়াই সমীচীন বোধে এই প্রকৃতিদত্ত উপাদান দ্বারা চিকিৎসা প্রণালী বা রোগ উপশম করিবার উপায় এতদ্দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হইতেছি। ইহার জন্য যদি কোন প্রতিবাদকারী সমুত্থিত হন তবে তাহার সহিত যুক্তি যুক্ত পথে এবং সত্যের জয়ের জন্য যে সমস্ত বাক্ সংগ্রাম করা দরকার তাহা করিতেও লেখকের দলভুক্ত ভদ্র সন্তানগণ এবং বেজওয়াদা ইণ্ডিয়ান নেচারোপ্যাথিক এসোশিয়েশনের পক্ষ হইতে যুক্তি তর্কের সমাধান করিতে প্রস্তুত আছি। বর্ত্তমান এলোপ্যাথী চিকিৎসা সম্পর্কে বিলাতের এবং লণ্ডন সহরস্থ রয়াল মেডিক্যাল কলেজের কতিপয় ফেলো মহোদয়গণের যে মন্তব্য তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও এস্থলে পাঠক পাঠিকার কৌতূহল নিবারণার্থ দেওয়া হইতেছে। ইহা হইতে সত্যের পথ বন্ধ এবং অসত্যের প্রাধান্য হইতেছে কিনা এবং বর্ত্তমান চিকিৎসা প্রণালী জগতের মহদনিষ্ট সাধন করিয়াছে কিনা এই গুলি জ্ঞাত হইলে এবং বিচার করিলে সত্যের মহিমা প্রচারিত হইবে। ইউরোপের কতিপয় প্রধান প্রধান এম ডি উপাধিধারী চিকিৎসকগণের নিজ নিজ মন্তব্য এবং লণ্ডন রয়াল মেডিক্যাল কলেজের প্রধান মেম্বরগণের মধ্যে কতিপয় মেম্বর কিরূপভাবে নিজেদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের এবং ঔষধের ফলাফল সরল ভাবে সত্যের জয়ের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাহাদের বক্তৃতায় বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

এখন মূল কথা হইতেছে যদি প্রকৃতিদত্ত উপাদান ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম ইত্যাদিই যখন সৃষ্টির মূল তখন ব্যাধির মূলেও ইহাদেরই ইতর বিশেষ হইয়া অর্থাৎ কোন উপাদানের আধিক্য, কোন উপাদানের অল্পতা কোনও উপাদানের অভাব ইত্যাদি কারণেই জীব দেহেও প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে নানাবিধ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে এবং সেই সেই বিপর্য্যয়গুলি শরীরের যে যে অংশের উপর যে ভাবে বিপর্য্যয় ঘটায় সেই সেই অংশের বিপর্য্যয়ের রোগের নাম ভিন্ন ভিন্ন হইয়া শাস্ত্রাকারে তাহারই চিকিৎসা পূর্ব্বতন চিকিৎসা প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ব্যাধির মূল কারণ এক হইতে পারে কিম্বা একই বটে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিপর্য্যয় ঘটানে রোগের নিদান ও নামকরণ পৃথক হইয়াছে মাত্র। মহামতি লুই কুনে ৪৩ বৎসর ব্যাপী চিন্তা করিয়া শরীর বিপর্য্যয়ের বা শারীরিক যন্ত্রের বিকৃত অবস্থার একটী মূল কারণ নির্দ্দেশ

করিয়াছেন। আমরা কবিরাজী, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, হাকিমি এবং অন্যান্য চিকিৎসা প্রণালীতে রোগের উৎপত্তির সংক্ষেপ এবং বোধগম্য হইবার উপযুক্ত কারণগুলি যেরূপভাবে দেখিতে পাই তাহাতে চিকিৎসা বিভ্রাট ঘটা আশ্চর্য্যজনক নয়। যেহেতু অন্যান্য চিকিৎসার মূলসূত্র অর্থাৎ শরীরের পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও বিপর্য্যয় দৃষ্টে রোগ নির্ণয় ও তাহার উপশম করিবার ঔষধ প্রয়োগ প্রণালীগুলি অলক্ষ্যে লোষ্ট্র নিক্ষেপের মত চলিতেছে। লাগিলে লাগিতেও পারে, না লাগিলে না লাগিতেও পারে, এরূপ মন্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অনিশ্চিত বিষয়ের অনিশ্চয়তা পরে প্রকাশ পাইয়া চিকিৎসকগণকে মনে মনে লজ্জাবোধ করিতে হয়। অনেক সময় বিষ ক্রিয়ায় রোগী ছট্‌ফট্‌ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ডাক্তার কিম্বা কবিরাজ মহাশয় তখন নিজ কৃত ত্রুটি মনে মনে চাপা ও ডিপ্লোমার দোহাই দিয়া খুনের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। এ সমস্ত ঘটনা এতদ্দেশে এত অধিক ঘটিতেছে এবং ঘটিবে বলিয়া সর্ব্বদাই আশঙ্কা আছে। আরও একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঔষধ অধিকাংশ পেটেণ্ট মেডিসিন যাহা কোনও ইউরোপীয় বণিক্ বা ব্যবসাদার তথাকার সংবাদ পত্র দ্বারা প্রশংসা প্রচার করাইয়া এ দেশী ডাক্তারগণের দ্বারা সেই পেটেণ্টগুলি চালাইয়াও এতদ্দেশের অনেক সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। ডাক্তারগণ সরলভাবে পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবস্থা দিয়া ফল না করাইয়া তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন কিন্তু সাধারণের তাহার রহস্যভেদ করা কঠিন এবং সঠিক বিচার হইলে ঐ ঔষধের দোষগুণ সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু এতদ্দেশীয় ডাক্তারগণ ভয়ে সে সমস্ত বিষয়ে কখনও হস্তক্ষেপ করেন না। ইহাতেও সমাজের সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে সুতরাং ডিপ্লোমাধারী ডাক্তারগণের দ্বারা আমূল চিকিৎসা প্রণালীর সংস্কার না হইলে এলোপ্যাথের চিকিৎসায় জনসাধারণের আসক্তি কমিয়া যাইবে, ইহাও আশঙ্কা করা যায়। যে কারণে জীব দেহ রোগাক্রান্ত হয় তাহার আদি কারণ মহামতি লুই কুনের এবং তাহার পদাঙ্ক অনুসরণকারিগণ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী স্বভার চিকিৎসকগণ যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার বাস্তবতা আমরা অস্বীকার করিতে পারিব না এবং এতদ্দেশীয় কোন ডাক্তার কবিরাজও তাহা ভ্রান্ত মত বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। যেহেতু তাহারাও এই মতের পরিপোষণ প্রকারান্তরে করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। দেহরূপ যন্ত্রখানা একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিন বিশেষ, ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ কল আছে। সামান্য একটু বিগড়াইলেই রোগ বলিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। কোন কোন সময় দীর্ঘকালব্যাপী প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটাইতে ঘটাইতে দীর্ঘকাল পর রোগ প্রকাশিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণার কারণ ঘটে। ইহার মূল কারণ মহামতি লুইকুনের morbid matter ও foreign matter নামে অভিহিত। কারণ আমাদের দেহরূপ যন্ত্র খানাতে নবদ্বার এবং অসংখ্য গবাক্ষ লোমকূপ রূপে বেষ্টিত আছে। নবদ্বারের মধ্যে প্রধান তিনটী দ্বার মুখ এবং মলদ্বার ও মূত্রদ্বার। মুখদ্বারা আহার্য্য উদর রূপ এঞ্জিনের ভিতর যায় এবং এঞ্জিনের কার্য্য শেষ হইলেই মলের ভাগ রেকটাম দ্বারা নিম্ন অংশে চালিত হইয়া পড়িয়া যায় এবং শরীরের জলীয় অসার ভাগ মূত্রাকারে জনন যন্ত্র দ্বারা নির্গত হয়। আমাদের শরীরে

মলমূত্র যথারীতি নির্গত না হইয়া পাকস্থলীর ভিতর কোনও কারণে আটকাইয়া গেলে তাহা শরীরের সাধারণ তাপে উত্তাপিত হইয়া মলভাণ্ডের ভিতরেই পচিতে আরম্ভ করে এবং উহা হইতে দূষিত বাষ্প শরীরের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া দুর্ব্বল অঙ্গকেই অগ্রে আক্রমণ করায় তখন ব্যাধিরূপে পরিণত হয় এবং তাহার দেশ ভেদে এক একটী নাম দিয়া চিকিৎসা করা হয়। মহামতি লুই কুনে বলেন যে, মরবিড ম্যাটার শরীরের ভিতর না জমিতে দিলেই রোগের মূল কারণ নষ্ট করা হয়। ঐ মরবিড ম্যাটার গুলি দুইটী মাত্র দ্বার না লইয়া শরীরের অন্যান্য অংশের লোমকূপ দিয়াও ঘর্ম্মাকারে নির্গতের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহাও প্রকৃতির পূর্ব্বোক্ত উপাদানের সাহাযোই হইতে পারে।

যাবতীয় রোগের প্রতিকার কল্পে মহামতি লুইকুনে তাঁহার নিজের বহুদিনের চিন্তা নিয়োজিত ফল দ্বারা সাধারণের হিতার্থে বিনা ব্যয়ে যে পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনের পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার নিজকৃত New Science of Healing পুস্তকের ১০০ পৃষ্ঠা হইতে ১১৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত রোগারোগ্যের পক্ষে তাঁহার যে সমস্ত উপাদান এজেন্ট স্বরূপে কাজ করে তাহাদের বিষয় তিনি গভীর গবেষণা পূর্ণ যে সমস্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তদ্দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে উষ্ণ জলীয় সূর্য্যোত্তাপে বা আতপস্নান, ঘর্ষণ সহ নাভি স্নান, ঘর্ষণ সহ লিঙ্গ স্নান; সাধারণতঃ এই গুলিই তাঁর remedial agents তা ছাড়া প্রকৃতির আরও মূল উপাদান মাটী বায়ু আকাশ এগুলিও রোগারোগ্যের পক্ষে কম সহায়ক নয়।

মরবিড ম্যাটার বা বিসদৃশ পদার্থ শরীরে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে না পারে তাহার জন্য আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহাও এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইতে পারে।

কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা যে জীব মাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং একমাত্র কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলেই শারীরিক যন্ত্রের কোনও বিকৃত ভাব আসিতে পারে না আর কোষ্ঠ কাঠিন্য হইলেই নানারূপ ব্যাধির আবির্ভাব অনিবার্য্য। এই যে সর্ব্ববাদি সম্মত বিষয়টার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি, কতকটা আলস্যের আশ্রয় লওয়ায়, কতকটা আহার্য্য সম্বন্ধে কদভ্যাস গ্রহণ করার ফলে, কতক অভাব অনটন জনিতও বটে; আমাদের দেশের মেয়েলী কবিতায় এখনও চলিত আছে।

"খায়, না খায় আগে, নায়
হয় না হয়, তিন বার যায়
তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?"

এই স্বতঃসিদ্ধ কথাটী আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার ভিতর যে সত্য নিহিত আছে, তা কয়জন আমরা নিয়মিত রূপে প্রতিপালন করি?

অভ্যাসেই সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করা যায়। ক্রমে তিন বার গতায়াত অভ্যাসের মধ্যে আনিলে এবং ঐ চিন্তাতেও অভ্যাসে পরিগণিত হয় বলিয়াই বোধ হয় "হয় না হয় তিন বার যায় কথাটা

মেয়েরা ব্যবহার করিত, যাহা হউক মল মূত্র রীতি মত ভাবে নির্গত হইয়া গেলে যে শারীরিক আরাম বোধ হয় একথা সকলেই অবগত আছেন—সুতরাং যাহাতে কদর্য্য আহার না হয়, কোষ্ঠ কাঠিন্য না হয়, এগুলি সম্বন্ধে সাবধান না হইলে যে কোন মতেই চলুন না কেন রোগ উৎপন্ন অনিবার্য্য।

অর্থাৎ স্নান আহার নিদ্রা এই তিনটাই জীবন রক্ষা কল্পে অতীব প্রয়োজনীয়। এই তিনটীর সমতা রক্ষা করার একটী সাধারণ ধারা আমরা মানিয়া লই। ইহার সমতা রক্ষার ব্যতিক্রম ঘটিলেই ব্যাধি জন্মিবার কথা।

জীব মাত্রকেই বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সবল সতেজ কর্ম্মঠ রাখিতে হইলেই নিয়মিত আহার অবশ্য গ্রহণীয় এবং আমরা নিয়মিত পান আহার স্নান নিদ্রা ইত্যাদির দ্বারা কলেবরটী বজায় রাখি। আমরা যাহাই আহার করি না কেন,সবই উদরে গিয়া পাকরসের সাহায্যে তাহা রস, রক্ত, মেদ, মাংস, অস্থি প্রভৃতির ক্ষয় রক্ষা কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া ও খাদ্য সামগ্রীর অবশিষ্টাংশ মলরূপে পরিণত হয়, ইহা মানব দেহের সাধারণ ধর্ম্ম।—একথা স্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ হয় না! মল নির্গমন হইবার জন্য প্রকৃতির দত্ত মলদ্বার এমন ভাবেই সৃজিত হইয়াছে যে সুস্থ দেহের মল নির্গত হইতে কোনই কষ্ট নাই বরং মল নির্গত হইয়া গেলে শারীরিক যে আরাম তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই মল নির্গমন ব্যাপারটার ভিতরেই একটী মহা সত্য বিদ্যমান আছে এবং তাহার সম্পর্কে কোন চিকিৎসা শাস্ত্রই অস্বীকার করে নাই। এই ব্যাপারে এক এক সম্প্রদায় এক এক রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তাহার নানা বিধ পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে প্রকৃতির সাহায্য না লইয়া নানাবিধ ঔষধ সৃষ্টি করায় চিকিৎসা জগতে নানারূপ বিভ্রাট জন্মিয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায় মল নির্গমন বাধা জন্মিলে জোলাপ লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন! এই জোলাপ লওয়া কার্য্যটা আপনারা অবগত আছেন। আমাদের বর্ত্তমান চিকিৎসা প্রণালী মতে জোলাপের বটিকা হরীতকী বাটা, ক্যাষ্টর অয়েল, সোনা মুখীর পাতা সিদ্ধ রস, ক্রোটন অয়েল, ম্যাগনেসিয়া সলফ প্রভৃতি এবং হোমিও প্যাথিক মতে সলফার, নক্স ভমিকা, ব্রাইওনিয়া প্রভৃতি ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এবং এই সমস্ত ঔষধের কোন কোনটায় বিষ ক্রিয়া স্বল্প বিস্তর আছে ইহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। যদি নির্দ্দোষ ভাবে বিনা ঔষধে প্রকৃতির দত্ত উপাদান ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইহার কোন একটি মূল উপাদান সাহায্যে মল নির্গমন সুলভে ও সহজে করান যাইতে পারে তবে কি তাহা আমাদের গ্রহণীয় নয়? ঔষধের ক্রিয়ার দ্বারা শরীরের এক অংশের উপকার করিতে যাইয়া বিষক্রিয়া নিবন্ধন অন্য অংশকে দুর্ব্বল বাতব্যাধিগ্রস্ত করা প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয়ে যদিও মল নির্গমন কার্য্যটিতে বাধা জন্মিয়াছিল তাহা প্রাকৃতিক সমতা রক্ষার জন্য ঐ প্রকৃতি দত্ত উপাদান ভিন্ন অপর কিছুই হইতে পারিবে না। বহুকালের কথা, যখন আমাদের এই ভারত ভূমিতে বেদ প্রচারিত হইয়াছিল যখন এই দেশে আয়ুর্ব্বেদের ও সৃষ্টি হয় নাই এবং যখন আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টির আবশ্যকতা উপলব্ধি

হয় নাই, তৎকালে মানব সমাজ বেদ মার্গ দ্বারাই চালিত ছিল এবং এখনও আমরা বৈদিক আচার ভ্রষ্ট হই নাই, আমাদের দেশে এখনও বেদের আদর আছে। এই বৈদিক যুগের প্রারম্ভ হইতে আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তদানীন্তন লোকাচার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই তদানীন্তন মানব সমাজ পঞ্চভূত সাহায্যেই শারীরিক যাবতীয় বিপর্য্যয় বা ব্যাধি বিনাশ করিতে সক্ষম হইত।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন লুইকুনে জার্ম্মানবাসী; এই জার্ম্মান দেশটী শিল্পে বিজ্ঞানে শিক্ষায় দীক্ষায় জগতের কোন জাতি অপেক্ষা হেয় নয়। এবং ঐ দেশীয় শিক্ষা প্রণালী আচার ব্যবহার যদিও আমাদের দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, তথাপি চিকিৎসা শাস্ত্র তাহারা আলোচনা করিতে যাইয়া ভারতের বেদ বাক্যগুলি অভ্রান্তজ্ঞানে তাহার সারভাগ তাঁহারা গ্রহণ করিতেছেন।

লণ্ডন নগরীর রয়াল মেডিকেল সোসাইটীর মেম্বরগণ মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিও প্রাকৃতিক নিয়মেরই জয়ধ্বনি করায় এক্ষণে আমরা বুঝিতেছি যে ঔষধ বলিয়া যে যে বস্তু বা বিষ প্রভৃতি আমরা বর্ত্তমান চিকিৎসকগণের উপদেশ মত গ্রহণ করিতেছি তদ্দ্বারা উপকার কমই হয় এবং কদাচিৎ প্রকৃতির সহায়তা করা হয় মাত্র। কিন্তু ঔষধের ক্রিয়ার ফলে যে বহুলোক বৎসরে বৎসরে অকালে কালের গ্রাসে পতিত হইতেছে তাহা তদ্দেশীয় চিন্তাশীলগণও অনুমান করিয়া তাহাদের বহু মন্তব্য বহু সভায় আলোচনা করিতেছে ঐ সমস্ত মন্তব্য এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণ দৃষ্টি করিলে নিজেদের স্বার্থের অংশ বাদ দিয়া ন্যায় চক্ষে বিচার করিলেই সত্য উদ্ধার হইতে পারে। রোগ উৎপত্তির বহু কারণ নির্দ্দেশ করিলে বহুবিধ চিন্তার আশ্রয়ে বহুবিধ পরীক্ষার ফলে বহু প্রকার ভ্রম আসিয়া পড়ে, তথাপি আমাদের দেশীয় কবিরাজ এবং ডাক্তারগণ রোগ উৎপত্তির কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া রোগের নাম দিয়া তাহার চিকিৎসা তত্ত্ব প্রচার করিয়া তন্মূলেই চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। এখন এই তত্ত্বের মধ্যে নানাবিধ ভ্রান্তিপূর্ণ বিষয় সংযোজিত থাকায় চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার্থিগণও ভ্রমপূর্ণ মূল সূত্র গুলি শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়া এবং তাহারাও রাজ সরকার হইতে ডিপ্লোমা পাইয়া মানুষ মারাতে অভ্যস্ত হইতেছে। চিকিৎসকেরও পুরা দোষ দেওয়া চলে না; যেহেতু তাহাদের authority বলিতেছেন সুতরাং দোষ authtrityর মূলে আঘাত না করিলে এই চিকিৎসা প্রণালীর এবং চিকিৎসকগণের সংশোধনের পথ আবিষ্কার হইতে পারে না। সিভিল সার্জ্জন হইতে এল, এম, এস্ নেটিভ ডাক্তার পর্য্যন্ত সকলেরই এক সুর কাহারও নিকট দেশের মঙ্গল আশা করা বিড়ম্বনা। যে হেতু তাহারা বিদেশীয় ধনলোলুপ পেটেন্ট মেডিসিন বিক্রেতা বণিকগণের এজেন্ট। ঔষধের ক্রিয়ার ফলাফল তাহারা বলিবার কেহই নয় তাহাদের অথারেটী ইহা prescribe করিতে উপদেশ দিয়াছেন সুতরাং দেওয়া হইতেছে। ভাল মন্দের ফলাফলের জন্য চিকিৎসক আইনতঃ এবং ধর্ম্মতঃ দায়ী নহেন। একথা আমরা চিকিৎসকের মুখেই সর্ব্বদা শুনিতে পাই, সুতরাং দেখিতেছি যে, কোন একটা পেটেন্ট মেডিসিন বা ঔষধ বিলাতের কোন বণিক বা ডাক্তার নামধারী ব্যবসায়ী ব্যক্তি আবিষ্কার করিয়া তথাকার খবরের কাগজে

কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রসংশা পত্রসহ ছাপাইলেই তাহার ধুয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া এদেশে খবরের কাগজে উঠিলেই আমাদের দেশীয় চিকিৎসকগণ ঐ সংবাদই যথেষ্ট মনে করেন এবং পেটেণ্ট চালান পক্ষে স্বাধ্য মত চেষ্টা করেন। এই পেটেণ্ট ঔষধ চালানের দোষ গুণ বিচার করিবার ভার অনভিজ্ঞ লোক লইতে পারেন না এবং চিকিৎসকগণও লয়েন না। সুতরাং অবাধে একটা কট্ মট্ নাম দিয়া একটা ঔষধ নামে বিষ সংযুক্ত জিনিস দেশে আসিয়া জুড়িয়া বসিতেছে। ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে ভারতীয় দ্রব্য গুণ দর্পণ বা বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধীয় শাস্ত্র বৃটিশ ফারমাকোপিয়া মেটেরিয়া মেডিকা (Both Homœopathy and Allopathy) প্রণেতাগণ বহু চিন্তা এবং বহু পরিশ্রম করিয়া অন্তরীক্ষে যে কি মন্থন করিয়া অমৃত স্বরূপ ঔষধ প্রচার করেন তাহার কিনারা কে করে ? আমাদের বেদে, আমাদের কোরানে খাদ্যাখাদ্য, আচার ব্যবহারের সব পন্থারই নির্দ্দেশ ছিল ও আছে। রোগ উৎপত্তি ও তাহার নিদান তাহাও নির্দ্দেশিত ছিল। বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্ প্রভৃতিতে জল মাটী বাতাস সূর্য্যতাপ আকাশ প্রভৃতির গুণ, রোগারোগ্যের কাহার কি ক্ষমতা, সবই আছে কিন্তু আমরা অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই যত গলদ। শিক্ষাভিমানি কতক দেশীয় লোক আত্মবিশ্বাসে জলাঞ্জলি দিয়া স্বভাবের পথ হইতে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদেশী ঔষধের প্রতি আস্থাবান হইয়াছেন। অর্থ শোষণেরও একটা সুবিধা ও সুযোগ করাইয়া অমঙ্গল সৃষ্টি করিতেছেন। আমরা যত রকম বিরুদ্ধাচরণ করি তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই ক্রমে স্বল্পায়ু শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছি। যদি ঘরে ঘরে প্রকৃতি দত্ত মূল উপাদানের দ্বারাই রোগ উপশম হইতে পারে, এরূপ শিক্ষা প্রণালী আলোচিত হয়, তবে দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে, সেই আশায় এই ব্যাপারে মনোযোগী হইতে প্রয়াস করিতেছি মাত্র। রোগোৎপত্তির মূল কারণ লিখিতে যাইয়া অনেক কথাই বেশী বলা হইল বলিয়া পাঠক পাঠিকা দুঃখিত হইবেন না। এ সমস্ত সত্যের আশ্রয় লইয়াই লেখা হইতেছে। সমস্ত রোগের মূল কারণ মরবিড্ ম্যাটার Morbid matter and foreign matter ইহা ছাড়া বাহিরের নানা কারণেও রোগ উৎপত্তি হয় সে গুলি শারীরিক যন্ত্র বিকৃতির ফল স্বরূপ নয়। যথা, আঘাত প্রাপ্ত হওয়া, আগুনে পুড়িয়া যাওয়া, কাটাদি দংশন জনিত নানা প্রকার উপসর্গ ভোগ করা, প্রভৃতি কারণে যে সমস্ত ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহার মূলে যদিও শরীরাভ্যন্তরস্থ পূর্ব্বোক্ত morbid matter বা foreign matter সংশ্রব নাই তথাপি বাহিরের প্রয়োগ অভ্যন্তরস্থ morbid matter foreign matter এর পরিপোষক স্বরূপ হইয়া দাড়ায়। তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ উপাদানই ঔষধ স্বরূপ কাজ করিয়া রোগমুক্ত করিয়া দেয় এগুলি পশ্চাৎ বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইবে। আমাদের শরীরস্থ দূষিত বস্তু সমূহ নানা আকারেই শরীর হইতে নির্গত হয় এবং তজ্জন্য শরীরে অসংখ্য লোম কূপ, নব দ্বার প্রভৃতি আছে। জলীয় দূষিত অংশ কতক মূত্রদ্বার দ্বারা এবং লোম কূপের অসংখ্য ছিদ্র দ্বারা ঘর্ম্মাকারে বাহির হইয়া যাওয়ায় শরীর স্বাভাবিক অবস্থা ঠিক রাখে। আমাদের কাণের দূষিত অংশ খইল রূপে এবং ক্লেদরূপে কাণের ছিদ্র দ্বারা বিনির্গত হয়। চক্ষুর ময়লা পিচুটি বা

কেতররূপে চক্ষু হইতে নির্গত হয়। নাসিকা দ্বারা কফ প্রভৃতি নির্গত হয়। মুখ দ্বারাও গলার অভ্যন্তরস্থ ক্লেদ ফুসফুসের সঞ্চিত কফ প্রভৃতি নির্গত হয়। মূত্রদ্বার দ্বারা জলীয় দূষিত অংশ বহির্গত হয়। সর্ব্বশেষ মলদ্বার দ্বারা খাদ্য বস্তুর অজীর্ণাংশ মলরূপে পরিণত হইয়া উহা বিষ্ঠা রূপে বহির্গত হইয়া যায়। এই বিষ্ঠারূপ পদার্থ সরলভাবে নির্গত না হইলেই অধিকাংশ রোগ সৃষ্টি হয়। মলদ্বার দ্বারা সম্পূর্ণ Morbid Matter নিঃশেষিত হইয়া পড়িয়া না গেলেই নিম্ন অঙ্গে ও কখন কখন ঊর্দ্ধ অঙ্গেও ভুক্ত দ্রব্যের শেষ অংশ সঞ্চিত হইয়া শরীরের অভ্যন্তরস্থ স্বাভাবিক প্রকৃতি দত্ত উত্তাপের প্রভাব বা পিত্তরসের প্রভাবে (এই পিত্তরসই শরীরের অগ্নি স্বরূপ এবং পঞ্চ রসের সহায়তাই খাদ্য বস্তু সকল ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া সারাংশ রস রক্ত মেদ মাংস প্রভৃতি রূপে শরীরের ক্ষয়িত অংশের পুষ্টি সাধন করে। ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে) তাপিত হইলেই তাহা যথাযথ ভাবে Steam গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে এই গ্যাস যদি অপান নামক বায়ুর সাহায্যে নিম্নগামী হইয়া নিম্ন ভাগের মল দ্বার দ্বারা বহির্গত হইয়া যায় তাহাতেও শরীরের কথঞ্চিৎ আরাম বা শান্তি বোধ হয়। আর যদি ঐ Steam বা gass নির্গত হইতে বাধা প্রাপ্ত হয় তবেই শরীরের নানা দ্বার দ্বারা নানাদিকে ধাবিত হইয়া যখন যে অংশ দুর্ব্বল দেখে সেই অংশকে আক্রমণ করে। শরীরের সর্ব্বাংশে ঐ তাপ ব্যাপ্ত হইলেই সমস্ত শরীর উত্তাপিত হয় এবং আমরা তাহার সাধারণ সংজ্ঞা জ্বর বলিয়া প্রকাশ করি। ঐরূপ যে অংশ যে ভাবে আক্রান্ত হয় সেই অংশের রোগের একটা নাম দিয়া থাকি মাত্র কিন্তু মূলে ঐ Steam বা gass ইহাই একমাত্র সমস্ত রোগের মূলীভূত কারণ বটে।

যদি রোগোৎপত্তির মূল কারণ ঐ Steam বা gass স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া জানা থাকে তবে ঐ Steam বা gass গুলিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইতে দিলেই এবং gass গুলিকে প্রকৃতির সাহায্যে অর্থাৎ পঞ্চভূতের সাহায্যে যদি জলরূপে পরিণত করা যায় তবেই রোগ উৎপত্তির বিনাশ সাধন হয়। এই বিষয়ের মৌলিক তত্ত্ব আমাদের দেশে অজ্ঞাত নাই, ইহা সকলেই জানেন কিন্তু রোগ নিরাময় করিতে যাইয়া আমরা বিভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করায় যত বিপত্তির কারণ ঘটে।

শ্রীমথুরানাথ দে।

পঞ্চদশ ভাগ ১—৪ সংখ্যা সভাপতির অভিভাষণ প্রবন্ধের ভ্রম সংশোধন

	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৪	স্বনা	স্বনাম
২	১৮	রাশে	রাধেশ
২	২১	চিরাগহপরায়ণ	চিরানুগ্রহপরায়ণ
২	৩৫	জাগরুক	জাগরূক
৩	১৮	ভবদিচ্ছায়	ভগবদিচ্ছায়
৩	২৮	গদ্য-প নাট্য	গদ্য-পদ্য-নাটকাদি
৪	১	চতুষ্টয়	চতুষ্টয়
৪	৮	উৰ্দ্ধতন	ঊৰ্দ্ধতন
৪	২৪	পূৰ্ব্বপুরুষর	পূৰ্ব্বপুরুষের
৫	১৪ পংক্তি উঠিয়া যাইবে।		
৫	৫	তাম্রপটি	তাম্রপটি
৫	৫	ফুটনোট ১৬৮৩	১৬৮১৩
৬	১০	বলিতেছি না,	বলিতেছি না।
৮	২৮	ন্যয়স্যাধিষ্টান	নয়স্যাধিষ্ঠান
১০	১৯	স্বগোত্র	সগোত্র
১৩	২১	ভূভি	ভূতি

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের কার্য্য বিবরণ।

ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ (১৩৩৪)

ভগবৎ কৃপায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রঙ্গপুর শাখা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে দ্বাবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ত্রয়োবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

সভাধিবেশন :—আলোচ্য বর্ষে ১২টা অধিবেশনের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭টা মাসিক ও ৫টী বিশেষ অধিবেশন। আলোচ্য বর্ষেও কতকগুলি সুহৃদ সাহিত্যিকের তিরোধান ঘটিয়াছে। তাঁহাদের তিরোধানে বঙ্গ সাহিত্যের—বিশেষ এই সভার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া বিশেষ অধিবেশনে তাঁহাদের জীবনের গুণাবলী আলোচনা করিয়া ভগবৎ সমীপে প্রত্যেকের আত্মার মঙ্গল কামনা করা হইয়াছিল।

সদস্য সংখ্যা :—আলোচ্য বর্ষে এই সভার আজীবন সদস্য ১ জন; বিশিষ্ট সদস্য ৪ জন; অধ্যাপক সদস্য ৩ জন সহায়ক সদস্য ৬ জন। সাধারণ সদস্য সংখ্যা ১১৫ জন। সর্ব্ব সমেত সদস্য সংখ্যা ১৩২ জন।

আয় ব্যয়

আয়—		ব্যয়—
গত বৎসরের উদ্বৃত্ত তহবিল—	১০১৬৵৩	আলোচ্য বর্ষের খরচ—২৭২॥/৯ পাই
আলোচ্য বর্ষের মোট আয়—	৩২২৲৬	
	১৩৩৮৵৯ পাই	
বাদ—	২৭২॥/৯	
	১০৬৫॥/০	মঃ এক হাজার পঁয়ষট্টি টাকা নয় আনা মাত্র

এই টাকার মধ্যে মাসিক শতকরা দশ আনা সুদে এক হাজার টাকা মাত্র দি জমিদার্স ব্যাঙ্ক লিমিটেডে স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা ও ৬৫॥/০ আনা সম্পাদক মহাশয়দিগের হস্তে আছে। এতদ্ব্যতীত পরিষৎ ৫০০৲ টাকা দিয়া স্থানীয় লোক রঞ্জন প্রেসের অংশ খরিদ করিয়াছেন। উক্ত প্রেস ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ বাবদ পরিষদের বার্ষিক ৬০৲ টাকা আয় হইতেছে।

ত্রয়োবিংশ বর্ষের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন

অধিবেশন	পঠিত প্রবন্ধ	লেখক—
প্রথম অধিবেশন	১। পরিণাম বাদ	১। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক ভবর ঞ্জনতর্কতীর্থ
২০।২।৩৪	২। রঙ্গপুরের ভৌগোলিক সংস্থান	২। „ দীনেশ চন্দ্র লাহিড়ী

এই অধিবেশনে ৮ খানি পুস্তক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের একখানি চিত্র সম্পাদক মহাশয় সভার গ্রন্থাগারে উপহার দিয়াছিলেন।

বিশেষ অধিবেশন ২৯.২।২৪	মধ্যযুগের ভারতীয় সাধক সম্বন্ধে বক্তৃতা—	বিশ্ব ভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন।

মহাত্মা কবীরের শিষ্য দাদূ ও তাঁহার কন্যাগণের ধর্ম্মজীবন এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যের সহিত বাদসাহ আকবরের চল্লিশ দিন ব্যাপী—সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনার বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া এরূপ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন, যে প্রত্যেকেই বিশেষ ভাবে মুগ্ধ হন। সহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন তাং ৮।৪।৩৪	রঙ্গপুরের প্রাচীন প্রসঙ্গ শ্রীযুক্ত কেশব লাল বসু অন্যান্য আলোচনা :—

শোক প্রকাশ—প্রথিত নামা সাহিত্যিক পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ ও পণ্ডিত যোগেন্দ্র নাথ বসু বি, এ মহাশয়ের তিরোধানে বঙ্গ সাহিত্যের এবং রঙ্গপুরের উকিল কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়ের মৃত্যুতে এই সভার যে ক্ষতি হইয়াছে তজ্জন্য সভা দুঃখ প্রকাশ করেন।

তৃতীয় অধিবেশন তাং ২৫।৫।৩৪	রঙ্গপুরের গ্রাম্যগীতি :— শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ।

প্রবন্ধ লেখক এই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া এই সভায় উক্ত প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই।

চতুর্থ অধিবেশন তাং ১১।৬।৩৪	গত অধিবেশনের প্রবন্ধ পঠিত হয়।	
পঞ্চম অধিবেশন তাং ২।৯।৩৪	হজরত মহম্মদের জীবনের একদিক	মুন্সী জামাল উদ্দীন আহম্মদ
ষষ্ঠ অধিবেশন তাং ২৯।১০।৩৪	শেষ যুগে উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সেবী ও সাহিত্য চর্চ্চা—	শ্রীযুত কেশবলাল বসু

এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় "রঙ্গপুরের অন্তর্গত সুপ্রাচীন কুণ্ডী জনপদের সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্ব নির্ম্মিত, দোল মঞ্চের খোদিত ইষ্টক" প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাতে হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মমত সমন্বয়ের পরিচয় প্রদান করেন।

বিশেষ অধিবেশন তাং ২।১১।৩৪	সুনাট্য প্রচলন ও ভারতীয় নাটকলা সম্বন্ধে আলোচনা	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এম, এ নাট্যকলা বিদ্।
সপ্তম অধিবেশন ২৭।১১।৩৪	স্বর্গীয় পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের তিরোধানে শোক প্রকাশ—	

প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাভূষণ রচিত :—"অস্তাচলে শশধর" এই প্রবন্ধটী পরবর্ত্তী অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

অন্যান্য আলোচনা—এই অধিবেশনে পাঞ্জাব প্রদেশস্থ লাহোর নগরে আহূত অরিএন্টাল কনফারেন্সের ৫ম অধিবেশনে এ সভার পক্ষ হইতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

(১) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম,এ তত্ত্ব-সরস্বতী (২) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ (৩) ধর্ম্মভূষণ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক।

বিশেষ অধিবেশন
১৯।১২।৩৪

এই সভার অন্যতম উপযুক্ত ও উদ্যোগী ছাত্রসদস্য ৺গিরিজা প্রসন্ন লাহিড়ীর অকাল মৃত্যুতে পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া এই সভা নিম্নোক্ত শোক প্রকাশক প্রস্তাব গ্রহণ করেন ;—

"রঙ্গপুরের গৌরব, জাগ্রত যুবকশক্তির অগ্রদূত ও অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী গিরিজা প্রসন্ন লাহিড়ীর অকাল মৃত্যুতে আমরা রঙ্গপুরের সমবেত জনসাধারণ ও পরিষদের সদস্যবৃন্দ আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার পূত ও শুভ্র আত্মা পরম পিতার শান্তিময় ক্রোড় হইতে বিধি নির্দ্দিষ্ট মহত্তর কোন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করুক।"

এতদ্ব্যতীত কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির দুইটী অধিবেশন আহূত হইয়া তাহাতে কার্য্যালয়ের কর্ম্ম ব্যবস্থা মূল সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরণ ও কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

পরিদর্শন :—আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষৎ মন্দির পরিদর্শন করিয়া সন্তোষজনক অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরিদর্শকের পরিচয়	পরিদর্শনের তারিখ
শ্রীযুক্ত এন্, এন্ নিয়োগী	৩।২।৩৪
" অধ্যাপক ক্ষিতি মোহন সেন বিশ্বভারতী শান্তি নিকেতন -	১।৩।৩৪
" ডাক্তার এ, সি, দত্ত এম, বি, সিবিল সার্জ্জন—	১৮।৩।৩৪

শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল নাগ
তাম্রহাট— ৩০।৩।৩৪

" নিমাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়
মাহিগঞ্জ— ১৭।১০.৩৪

পত্রিকা প্রকাশ—আলোচ্যবর্ষে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৪শ ভাগ প্রথম সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে উহার ২য় সংখ্যা মুদ্রিত হইতেছে। অর্থাভাবে নিয়মিত চারি সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না।

মন্দির সংস্কার—আলোচ্য বর্ষে স্থানীয় পরিষৎ মন্দিরের আবশ্যকীয় সংস্কারাদি সম্পন্ন করা হইয়াছে। দূরাগত সাহিত্যিক দিগের অবস্থানের জন্য একটা প্রকোষ্ঠও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সুরম্য প্রকোষ্ঠে সাহিত্যিকগণ বাস করিয়া পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান বা অন্যান্য সাহিত্যিক গবেষণা কার্য্য করিতে পারিবেন।

আগামী বর্ষের প্রথম হইতেই যাহাতে ছাত্রসভা ভাল ভাবে পরিচালিত হয় তাহার প্রচেষ্টা হইতেছে।

চতুর্বিংশ সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ (৩৩৫)

১৩৩৬ বঙ্গাব্দে এই সভা পঞ্চবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে এই সভার চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্য্য বিবরণ বিবৃত হইল।

সদস্য সংখ্যা—	আজীবন	বিশিষ্ট	অধ্যাপক	সহায়ক	ছাত্র	সাধারণ	মোট—
১৩৩৫	১	৩	৫	২	৪৮	১০৮	১৬৭

সদস্যের মৃত্যু—আলোচ্যবর্ষে পরিষদের সদস্য বঙ্গীয় থিওসফিক্যাল সোসাইটির রঙ্গপুর শাখার সুযোগ্য সম্পাদক প্রিয়নাথ পাকড়াশী জমিদার, অমূল্য দেব পাঠক বি, এল, দিনাজপুর, তারাসুন্দর রায়, বি এল, গাইবান্ধা, যাদবচন্দ্র দাস বাণীভূষণ, তুষভাণ্ডার রঙ্গপুর, নবদ্বীপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সাহাজাদপুর পাবনা এবং গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর; ছাত্র সদস্য গিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ এম্ এ, মহাশয়ের পরলোকগমন সংবাদ এই সভা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছেন।

ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক অধিবেশন—১২ই শ্রাবণ ১৩৩৫ তারিখে অপরাহ্ণ ৪টার সময় সভার কার্য্যারম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী স্যরিয়র কে, টি, সি, আই, ই; এম্ এ, ডি, এল, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ অধিবেশনের বিস্তৃত কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মাসিক অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে মাত্র ছয়টি মাসিক অধিবেশন হইয়াছে।

অধিবেশনের তারিখ	পঠিত প্রবন্ধ	লেখক
১ম অধিবেশন	"অস্তাচলে শশধর"	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৩০ বৈশাখ ১৩৩৫		
	"স্মৃতি পূজা"	শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার সেন

২য় অধিবেশন ৩রা আষাঢ়, ১৩৩৫	"লক্ষ্মীদেবীর ব্রতকথা"	শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৩য় অধিবেশন ২৪ ভাদ্র, ১৩৩৫	"বাউল সঙ্গীত ও লালন সা ফকীর"	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ সেন
৪র্থ অধিবেশন ৮ই পৌষ, ১৩৩৫	"বঙ্গভাষা"	কুমারী সিন্ধুবালা আকন্দী
		রাজসাহী বিভাগের সুযোগ্য কমিশনার মিঃ জে, এন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক গভর্ণমেণ্ট তহবিল হইতে প্রদত্ত পরিষদের উন্নতিকল্পে—এককালীন ১৫০্ দান প্রাপ্তির সংবাদ।
৫ম অধিবেশন ১৪ মাঘ, ১৩৩৫	...	পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ পঠিত হয়।
৬ষ্ঠ অধিবেশন ২৭ ফাল্গুন, ১৩৩৫	..	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক "বিষ্ণুমূর্ত্তি" শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন।

উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—আলোচ্যবর্ষে স্যর ডক্টর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী নাইট কে, টি, মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত ১২।১৩ শ্রাবণ শনি ও রবিবার, রঙ্গপুরে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজা গোপাল লাল রায় বাহাদুর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি-রূপে তাঁহার মনোজ্ঞ অভিভাষণ পাঠ করেন। বঙ্গের নানাস্থান হইতে সমাগত সাহিত্য সেবকগণের আগমনে রঙ্গপুর ধন্য হইয়াছিল। বাণী সেবকগণের মধ্যে পরস্পরের ভাব বিনিময়ের জন্য রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর তাজহাট রাজপ্রাসাদে সান্ধ্য সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। উক্ত সম্মিলনের একাদশ অধিবেশনের সচিত্র বিস্তৃত কার্য্য বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে।

চিত্রশালা পরিদর্শন—রাজসাহী বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত জে, এন, রায় শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, হিন্দু মিশনের ট্রাষ্টি ব্রহ্মচারী উপেন্দ্র কৃষ্ণ, বঙ্গীয় রাষ্ট্র সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়গণ সভার চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

আয় ব্যয়—সভার সর্ব্বপ্রকারের আয়-	৮৯১॥৶০
গত বর্ষের তহবিল—	১০৬৫॥/০
বাদ সর্ব্বপ্রকার ব্যয়—	৮০৪/৯

স্থায়ী ধনভাণ্ডারে রক্ষিত ২৫০০্ টাকা টাকা বাদে সভার তহবিলে ৫৩৶৩ উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

পরিষদের চিত্রশালা ও গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে মঞ্জুরী বার্ষিক তিনশত টাকা হিসাবে দুই বৎসরে এক যোগে ছয় শত টাকা আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সদস্যগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

১ম অধিবেশনে নির্দ্ধারিত হয়,—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কীয় আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে আলোচনার ফল শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায় বি, এল, মহাশয় ব্যক্ত করিলে স্থির হয় যে, ঐ সম্বন্ধে আলোচনানুরূপ মন্তব্য লিখিয়া সম্পাদক মহাশয় যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনে পরিষদের পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের অধিকার থাকা সভার মতে বাঞ্ছনীয় এবং প্রস্তাবিত পাণ্ডুলিপিতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনে জনসাধারণের প্রতিনিধির আধিক্য সম্বন্ধে যেরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা এ সভার মতে সম্পূর্ণ সমর্থন যোগ্য, ইহাও জ্ঞাপন করা হয়। এ বিষয় প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় মহাশয়ের নির্দ্দেশিত বিধিই সমীচীন বলিয়া এই সভা মনে করেন।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পদক পুরস্কার। আলোচ্য বর্ষে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ছাত্র সদস্যদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট লেখকবৃন্দকে দেওয়া হইবে।

প্রবন্ধের বিষয়—	পদক দাতার নাম—
১। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপ	রৌপ্যপদক শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।
২। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের কর্ত্তব্য—	স্বর্ণপদক— শ্রীযুক্ত রাজা গোপাল লাল রায় বাহাদুর।
৩। নারী শিক্ষা……	বিমল কুমারী রৌপ্যপদক (স্বর্গীয় পত্নীর স্মরণার্থ) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র রায়চৌধুরী
গিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের "সাহিত্য সাধনা"	রৌপ্যপদক শ্রীযুক্ত কালীপদ বাগছী।

আরও সুবিধা!   আরও সুবিধা!!

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বিস্তৃত কার্য্য বিবরণ সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী নিম্নলিখিত সেট্ প্রস্তুত আছে। যাঁহারা সম্পূর্ণ সেট্ গ্রন্থাবলী ক্রয় করিবেন তাঁহারা কেবল ডাকমাশুল প্রেরণ করিলে সেট্ প্রাপ্ত হইবেন।

তৃতীয় অধিবেশন—গৌরীপুর (দ্বিতীয় খণ্ড)	ডবল ক্রাউন	১৬ পেজী	আকারে	২৩৪ পৃষ্ঠা।
চতুর্থ অধিবেশন—মালদহ	"	"	ঐ	২৫০ পৃষ্ঠা।
পঞ্চম অধিবেশন—কামাখ্যা	"	"	ঐ	১২২ পৃষ্ঠা।
ষষ্ঠ অধিবেশন—দিনাজপুর	"	"	ঐ	৩৫০ পৃষ্ঠা।
৭ম অধিবেশন—পাবনা	"	"	ঐ	৩০০পৃষ্ঠা।
নবম অধিবেশন—রঙ্গপুর ••	"	"	ঐ	

সভাপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের অভিভাষণ—৪০ পৃষ্ঠা।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলীভুক্ত নিম্নোক্ত পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে:—

(১) গৌড়ের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (হিন্দু রাজত্ব) মালদহের সুযোগ্য পণ্ডিত স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত। মূল্য ৸০ আনা।

(২) সত্যনারায়ণের পাঁচালী—কবি সম্রাট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ স্বর্গীয় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত ও শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারে এণ্টিক কাগজে ১২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা।

(৩) সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি—বগুড়ার সাধক কবি গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় রচিত—পুনর্ম্মুদ্রিত হইবে। মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

অদ্যই পত্র লিখিয়া গ্রাহক হউন।

ধর্ম্মভূষণ—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ মন্দির।
রঙ্গপুর।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর শাখার নিয়মাবলী।

১। উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রত্নতত্ত্ব, প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব কৃষি শিল্পতত্ত্ব, সম্ভ্রান্তবংশীয়গণের ইতিবৃত্ত, প্রাচীন অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথিগুলির উদ্ধার এবং কবিগণের বিবরণ সংগ্রহ, প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা ও বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধনার্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

২। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি এই সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে এককালীন পাচশত বা তদূর্দ্ধ পরিমিত অর্থ দান করিবেন, তাঁহারা সভার আজীবন সদস্য ও পরিপোষকরূপে পরিগণিত হইবেন।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই সভার [illegible] সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ। যথারীতি [illegible] পর সম্পাদক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকট তৎসংবাদসহ একখানি "সদস্যপদ স্বীকারপত্র" [illegible] পাঠাইয়া দিবেন। নির্ব্বাচনের তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে ঐ সদস্যপদ স্বীকারপত্রে [illegible] অংশগুলি পূর্ণ করিয়া ১৲ টাকা প্রবেশিকা (রঙ্গপুরবাসী উভয় সভার সদস্যের পক্ষে) ব [illegible] মাসের অগ্রিম চাঁদা ন্যূনকল্পে ১৲ টাকা (কেবল শাখা-সভার সদস্যের পক্ষে সম্পাদকের নিক[illegible] তাঁহাকে সদস্যশ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

৪। মূল ও শাখা পরিষদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উভয় সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ৷০ আনা এবং শাখা পরিষদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কেবল শাখা সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ।• আনা চাঁদা দিতে হয়। অধিক হইলে আপত্তি নাই, সাদরে গৃহীত হইবে। উভয় সভার সদস্যগণ মূল ও শাখা উভয় সভার যাবতীয় অধিকারসহ প্রকাশিত পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন; কেবল শাখা-সভার সদস্যগণ শাখা-সভার যাবতীয় অধিকারসহ পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। শাখা-সভার সংগৃহীত যাবতীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠের অধিকার উভয় প্রকারের সদস্যগণেরই থাকিবে।

৫। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সাহিত্যসেবায় ব্রতী থাকিয়া বিশেষভাবে শাখা-পরিষদের উপকার করিবেন, তাঁহারা চাঁদা দিতে অক্ষম হইলেও, এই সভার অধ্যাপক বা সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এরূপ সদস্যকে সভার উদ্দেশ্য সম্পাদন জন্য কোনও না কোনও কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ।

৬। সদরের সদস্যগণের নিকট তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে মাস মাস বা বর্ষ মধ্য ও শেষভাগে চাঁদার খাতা পাঠাইয়া দিয়া চাঁদার টাকা গৃহীত হয়। মফঃস্বলের সদস্যদিগের নিকট বর্ষ মধ্যে ও শেষভাগে ভি, পি, যোগে পত্রিকাদি পাঠাইয়া চাঁদার টাকা লওয়া হয়। এইরূপে বৎসরের চাঁদা বৎসরের মধ্যে শোধ করিয়া না দিলে কেহ পত্রিকাদি প্রাপ্তির দাবী করিতে পারিবেন না। উভয় সভার সদস্যের দেয় অন্যূন ॥ চাঁদার অর্দ্ধাংশ মূল সভা এবং অপরার্দ্ধাংশ শাখা সভা স্ব স্ব পত্রিকাদি উক্ত প্রকারে ভি, পি, যোগে প্রেরণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। মূল সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি মূল সভা এবং শাখা-সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি শাখা সভা স্ব স্ব ব্যয়ে বিতরণ করিবেন।

৭। কেবল রঙ্গপুরবাসীর একত্রে মূল ও শাখা উভয় সভার সদস্যপদ গ্রহণের অধিকার আছে। যে সকল সদস্য ১৩২• সালের পূর্ব্বে উভয় সভার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারা রঙ্গপুরের অধিবাসী না হইলেও তাঁহাদের উভয় সভার অধিকারাদি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৮। রঙ্গপুর শাখা পরিষদের অন্যান্য যাবতীয় নিয়ম মূল সভার অনুরূপ।

সভা সম্পর্কীয় টাকা ও বিনিময় পত্রাদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় সভার সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।